প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য—আড়াই টাকা।

প্রিণ্টার—
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুচরিতাসু

সকালের দিকে ব্যস্ত ছিলাম কাজে। ডাক পিওন এসে একটি বেশ বড়োসড়ো প্যাকেট দিয়ে গেল। প্রথমে ভেবেছিলাম, কোনও পত্রিকা। খুলে দেখলাম, পত্রিকা নয়, একটি হাতে লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। দেখে বিশেষ অবাক হলাম না। ভয়ও পেলাম না। হয় তো কোন লেখক বন্ধু অনুগ্রহ করে তাঁর উপন্যাস পড়তে পাঠিয়েছেন। যাই হোক, হাতের কাজের তাড়ায় প্যাকেটটি মুড়ে রাখতে গিয়ে নজরে পড়ল, প্রথমেই লেখা আছে, 'প্রিয় বন্ধু।' আজকাল অনেক লেখক এভাবেও উপন্যাস শুরু করেন ভেবে প্রথম লাইনটির উপরে চোখ বুলিয়ে নিতে গেলাম। কেননা, হাতে বড় কাজের তাড়া। প্রথম লাইনটি পড়ে এখন রেখে দিলেও ক্ষতি নেই। অবসর সময়ে পড়লেই হবে। কিন্তু প্রথম লাইনটি পড়তে গিয়ে কয়েকটি লাইন পড়ে ফেলতে হ'ল। প্রথম শুরু হয়েছে, "প্রিয় বন্ধু, মনে করো না, কোন লেখার পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে তোমাকে বিব্রত করছি। লিখতে পারিনে ভেবে আজ বড় আফসোস হচ্ছে। যদি পারতাম! না পারি, তবু কী আশ্চর্য! সাধারণ মানুষও কোন কোন সময়, তার সুখ-দুঃখের এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছয়, যখন তারও দোয়াতকলম নিয়ে বসতে ইচ্ছা করে, লিখতে ইচ্ছে করে। তখন সেও বোধহয় সাহিত্যিকের কাছাকাছি পৌঁছয়। জানিনে কোথায় পৌঁছয়, কিন্তু সমস্ত অর্গল বন্ধ করে, এই একটি মাত্র বস্তু আছে, এই কাগজ। যার উপর সহস্র অঙ্কনে মনের একটি দর্পণ তৈরি করা যায়। একটি দর্পণ, যার গায়ে পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, সৌন্দর্য ও কলঙ্কের অবিকল ছায়া পড়ে। এ হয় তো কোন সাহিত্যের সংজ্ঞা হয়ে গেল। কিন্তু আমি সাহিত্য করতে বসিনি। আমি তোমাকে দু'পাতা পত্র লিখতে বসেছি। হাতের লেখা দেখে যদি চিনতে না পারো, তবে পাতা উল্টে আর ইতি দেখতে হবে না। আমি নিখিলেশ।"

তিনেক প্রায় তাকে দেখিনি। কলকাতায় যাতায়াত করি বটে, কিন্তু নিখিলেশের সঙ্গে দেখা করার সময় হয়নি, প্রয়োজনও হয়নি। শুধু জানতাম, সে খুব অভাবের মধ্যে আছে। ভাবে আর কতজনা আছেন এ সংসারে, তা জানিনে। নিখিলেশের অভাবের মধ্যে যখন আমি কোন ভাব ফোটাতে পারব না, অকারণ করুণ মুখে যাওয়া আসায় লাভ কী! জানতাম, একদিন দেখা হবে নিশ্চয়ই নিখিলেশের সঙ্গে। আর কেন জানিনে, কেবল মনে হ'ত, নিখিলেশের সেই শ্যামল মুখ, করুণ দুটি চোখ, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, প্রায়ই আধময়লা, একটু আধটু ছেঁড়াখোঁড়া ধুতি পাঞ্জাবীতে, তার ব্যক্তিত্বের কাছে অনায়াসে চাপা পড়া দারিদ্র-পীড়িত মূর্তিটিকে আমি হঠাৎ একদিন দেখব, চকচকে জামা কাপড়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হাসি উজ্জ্বল মুখে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন এরকম মনে হ'ত জানিনে। মনে হ'ত, ও এসে বলবে, যাক্ বাবা, একটা গোয়াল টোয়ালে যাহোক করে এবার ঢুকে পড়েছি। অর্থাৎ ওর চাকরি বাকরি একটা কিছু জুটেছে।

সেই নিখিলেশ। বাংলায় এম, এ, পাশ করেছিল। সেটাও বলার মত পাশ কিছু নয়। অধ্যাপক হওয়ার ধাপের নীচে ছিল সে। সেদিক থেকে হাইস্কুলে বাংলা পড়াবার মত মাস্টারি ছাড়া অন্য কোন রাস্তা ছিল না। কিন্তু নিখিলেশকে এসব নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাতে দেখিনি। বরং কিছুটা আদর্শবাদী, তার চেয়ে বেশি, একটু গোঁড়া ধরনের ছেলে। কবিতা লিখত না, কবিতা ব্যাখ্যার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। দুঃখপরায়ণতা ছিল তার একটি বিশেষ গুণ। কর্তব্যের জন্য ত্যাগবরণ করা ছিল অধিকাংশ বক্তব্যের সারবস্তু। যেমন প্রেমের ব্যাপারে, এক নায়িকার প্রতি বিরূপ কটাক্ষ করলে, নিখিলেশের আক্রমণ সেখানে ক্ষুরধার। আর সে যখন ওইসব কথা বলত, তখন সব ভালো মেয়েরা তাকিয়ে থাকতো তার দিকে বিস্মিত শ্রদ্ধায়। রাজনীতির দিক থেকে, কোন কিছুতে তার ধৈর্যের ছিল বড় অভাব। অবশ্য এদিকটিই ছিল তার সবচেয়ে নীরবতম দিক। আর ধৈর্যহীন ছটফটানিটুকু ছিল খুব চাপা। খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু, যারা রাজনীতি করত, তাদের কাছে মাঝে

তার হতাশা অবিশ্বাস। বলত, আর করে হবে! সকলেই মুখে বলছেন অনেক কথা। কিন্তু এ পিঁপড়ের গতি শেষ পর্যন্ত আমাদের একটা গর্ত্তের মধ্যে নিয়ে ফেলবে। যেখানে আমরা গোটা মধ্যবিত্ত সমাজটা চাপা প'ড়ে মরব। বলতে বলতে তার চোখে দেখা দিত অদ্ভুত ভীরুতা।

কিন্তু নিখিলেশ সাধারণভাবে, বাইরে খুব মিশুক, মিষ্টভাষী। মেয়েদের সামনে সব সময়েই একটু লজ্জিত হয়ে পড়ত। সেই লজ্জার অসচ্ছন্দতার মধ্যেও একটি সচ্ছন্দ তরল স্রোত কিন্তু বইত। অর্থাৎ তার সঙ্কোচটুকু সারল্যের প্রতীকচিহ্ন হয়ে তাকে সকলের আরো বেশি কাছাকাছি করে দিত।

সেই নিখিলেশ। নিখিলেশ গাঙ্গুলি! বাপ-মা ছিল না জানতাম। ছিল এক কাকার কাছে। বাড়ি ছিল বর্ধমানের কোন্ এক দূর গাঁয়ে। তাকে কোনদিন সেখানে কেউ যেতে দেখেনি। একসময়ে তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা হয়েছিল সাহিত্যের জন্যেই। বছর পাঁচেক আগের কথা। তখন সে পোস্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্র, আমি করি সাহিত্য।

সেই নিখিলেশকে চোখে দেখা হল না, এতদিন বাদে একটি চিঠি। চিঠি? এ কি সত্যিই চিঠি? হাতে আমার অনেক কাজ। তবু অবাক হয়ে তার পরের কয়েকটি লাইন না পড়ে পারলাম না। পরের প্যারাগ্রাফে শুরু হয়েছে,

"এটা শুধু দুপাতা পত্র লেখা নয়। যা ঘটে গেছে, তা একজনকে সব বলা। একলা একলা, নিজের মনে সব কিছু বিচার বিশ্লেষণের সাহস নেই, তাই একজনকে বলতে হবে। মুখে বলার চেয়ে, লিখে বলা আমার পক্ষে খুবই কঠিন। মনে হচ্ছে, আমাকে যেন কেউ এসে গলা টিপে ধরছে, আমি তবুও বলছি। যে এসে গলা টিপে ধরছে সে আর কেউ নয়, পাপ। একলা পেলেই পাপের আনাগোনা বেশী। তবু যদি সব বলে ফেলতে পারি, তা হলে বেঁচে যাব এ যাত্রা। বেঁচে যাব, যদিও আমার এই রক্তমাংসের পা দুখানি, রেলের লোহার চাকার মত, বাঁধাধরা লাইনের উপর পড়ে গেছে। লাইন ছাড়া, আর কখনো বোধহয়, গাছের ছায়ায় মেঠো পথের অবাধ বিস্তারের স্বাদ পাব না। তবু বেঁচে যাব। আর না বলতে

পারলে, আমাকে পাপের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরতে হবে। শুনেছি, প্রেতের ছায়া পড়ে না। আমার পড়বে। একটি নয়, আমি দুটি ছায়া নিয়ে ফিরব। দুটি ছায়া আমারই, আমার পায়ে পায়ে চলবে।

"ভাবছ, তোমাকেই লিখছি কেন? ভাবছ, হয়তো, আমাকে নিয়ে গল্প লেখার জন্য তোমাকে এসব কথা লিখে পাঠাচ্ছি। আর যাই হোক তুমি আমার সাহিত্যের মতামত জানো, তোমার বিষয়েও আমি জানি। এ জানাজানির মধ্যেও তুমি অন্ততঃ এটুকু বিশ্বাস করবে, এ কাহিনী নিয়ে গল্প লেখা তো দূরের কথা, তোমার পক্ষে কাউকে মুখে বলবার মতও উপযুক্ত নয় আমার এ কাহিনী। এমন কি, আমার এ ঘটনাটিতে যদি যুগের কিছু ছাপও থাকত, (কেননা, পাপেরও তো যুগ আছে। এক এক যুগে পাপের চেহারা এক একরকম হয়) তাহলেও তুমি চেষ্টা করতে হয়তো। এ একটি উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনাপূর্ণ রোমহর্ষক কাহিনীর মত। ভাবো, আমি কোথায় আছি, কতদূরে পেছিয়ে গেছি। এ সেইযুগের একটি পচা গল্প, যার মধ্যে তখনকার দিনে হয়তো কিছু যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতে পারত। একটি দীর্ঘশ্বাসের বাতাস লাগত, একটু মহত্বের সন্ধান পাওয়া যেত, বেদনার কিছু মূল্য দেওয়া যেতে পারত। এমন কি সেই যুগের অর্থাৎ বাংলার ভিক্টোরিয়ান যুগের র‍্যালার মধ্যেও যে যুবকদের, নব্য শিক্ষার, সংস্কৃতিতে প্রতিনিধি স্থানীয় বলা যেত, এ কাহিনী তাদের হলেও, 'পরিশিষ্টের' বক্তব্য দিয়ে একটি মহৎ কাহিনী লেখা যেত। এখন এ-কাহিনী, মহৎ অমহৎ, কোন পর্যায়েই পড়েনা। সুতরাং তোমার লেখার জন্য আমি লিখতে বসিনি। তোমাকে সব বলতে চাই। এই জন্যে যে, তারপরে তুমি হয়তো আমাকে কিছু বলবে। হয়তো বলবে, তোমার সেই সবচেয়ে প্রিয় কথাটি, 'নিখিল, যা সাধারণ, তা-ই অসাধারণ। সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি অসাধারণ। জীবনকে সহজভাবে নিয়ে তুমি সামনে চল।

"চলব। চলতেই তো হবে। কিন্তু কী ভয়াবহ অসাধারণত্ব নিয়ে আমাকে চলতে হবে। বাংলায় একটা কথা আছে। 'পাকতেড়ে' মেরে যাওয়া আমার অসাধারণত্ব সেই রকম। আমি গোড়াতেই নিদারুণ ভাবে অসাধারণ

হ'য়ে উঠলাম। অথচ আত নগন্ত ছাড়া কারুর জাবনে এমনাট ঘটে না। আর সেদিক থেকে ঘটনাও অতি সাধারণ। তবু, সাধারণ হওয়ার সাধনাই আজ আমার সবচেয়ে বেশি।

"সেইজন্যে তোমাকে লিখছি। কলকাতায় কাকে বলব, লিখব কাকে। চারদিকে একটা অদ্ভুতরকম নীরব ঢি ঢি পড়ে গেছে। গা টেপাটেপি করেছে অনেকে, হাসছে কেউ, রাগ করছে অনেকে। ঠাট্টা বিদ্রূপের তো কথাই নেই। ওরা যে এরকম করছে, তার একটি কারণ আমি বুঝি। সেই কারণ হচ্ছে, ওরা কিছুই জানেনা। অথচ কতগুলি অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করেছে মাত্র। শুনেছে কিছু উড়ো খবর। সেগুলি নিয়ে সবসময়েই ওরা গল্প তৈরি করতে ব্যস্ত। মত্ত হয়ে আছে চা-খানা আর কফি-খানায়। সেই খানা-ডোবায় ডুব দিয়ে ওদের কাছে আমি কিছু বলতে গেলে, সেই খানা বাসি তাড়ির রসে গাঁজিয়ে ওঠা ছাড়া আর কিছু হবে না। আর এই বাসি তাড়ির এমনি একটি মাদকতা আছে যে, অনেক আদর্শবাদীও মনে মনে বলবে, 'মাইরি, এমনটি যদি আমাদের হ'ত তো, কোন আক্ষেপই করতাম না। কুছপরোয়া নেই নিখিল, পানসী চালিয়ে দাও।' ইতিমধ্যেই দুএকজন, আধাখ্যাচড়া কাহিনী শুনেই এসব কথা বলেছে, তাই লিখলাম।

"গানের চেয়ে আলাপ বেশি হচ্ছে বোধহয়। দু'পাতার পত্রে ধরতাই হবে কিনা, বুঝতে পারছিনে। আসলে, কিছু গজলের রেশ আছে বোধহয় এ গানে। আলাপ ছেড়ে বোলে রক্ষা করতে পারব কিনা সে ভয় আমার পদে পদে। বোলেতেই তো আসল বুলি। সেই মর্মান্তিক বুলি আওড়াতেই তো বড় ভয়। কেমন করে বলব। অথচ না বললে উপায় নেই। গলা বন্ধ হয়ে গলদঘর্ম হয়ে, একবার শেষ করতে পারলে, আমি রেহাই পাই। কোন কথা তোমাকে লুকোব না। নিজের কথা একটুও অন্যরকম করে লিখব না। নিজেকে নিয়েই তো বিপদ সবচেয়ে বেশি। তবু, যতটুকু নিজেকে বুঝতে পেরেছি, ততটুকুর মধ্যে কোন ফাঁকি দেব না। আমার-ই কথা যে সব। আমার-ই কথা, যার কথা পড়তে পড়তে তোমার মনে হবে, মানুষটিকে বুঝি সম্মোহন করা হয়েছিল, কিংবা কোন বিষাক্ত ইনজেকসন করে

হয়েছিল। নয় তো ইনস্যানিটি থেকেই উদ্ভব হয়েছে এসবের। কিন্তু তা নয় সম্মোহন আমাকে কে করবে। ইনস্যানিটি তো আসলে দুর্বলেরই বিকার। যা ঘটেছে, তার জড় ছিল নিশ্চয়ই আমার মধ্যে। আমার রক্তকোষে, শিরায় শিরায়। একজন মানুষ হঠাৎ জলে পড়ে না। ঢালু সৈকত পার হয়ে এসে তাকে জলে পড়তে হয়। আসলে আমার চরিত্রের মধ্যেই নিশ্চয় গড়িয়ে পড়ার মেটিরিয়াল ছিল। তা তোমার কাছে কোনদিন ধরা পড়েনি। আশ্চর্য! আমার কাছেও কোনদিন ধরা পড়েনি। এমন কি, সুপ্রীতির কাছেও নয়।

"সুপ্রীতিকে মনে আছে তো তোমার! আমার সঙ্গে যাকে তুমি অনেকবার দেখেছ। দেখেছ, টিপে টিপে হেসেছ আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে। যেন তুমি টের পেয়েছিলে কিছু। তখন পাইনি শুধু আমরা। তারপর তুমি একদিন পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করেই ফেললে আমাকে। আমি বললাম, নাঁ। তুমি বললে, হ্যাঁ। তোমার সেই হ্যাঁ অক্ষয় হয়ে গেছল আমাদের জীবনে। না, না, মিথ্যে কথা। অক্ষয় হয়ে যায়নি, আমি অক্ষয় করতে পারিনি সুপ্রীতিকে। কেমন করে পারব। সেই মুখ ভাবতে আমার ভয় করছে, তার নাম লিখতে পর্যন্ত আমার কলম সরছে না। কেননা, তুমি জানো, সে ছিল সর্বাংশে এ যুগের মেয়ে। যে যুগকে আমরা আমাদের পচা চোখ দিয়ে দেখেছি আর ভেবেছি, মেয়েরা হয়ে গেছে পোশাক আর রং সর্বস্ব। ভেবেছি, বুঝি সারা মেয়ে সমাজটাই তাদের শরীরের প্রতিটি কোণে কোণে কৃত্রিম অস্ত্র দিয়ে শাণিত করে তোলার গুপ্তলীলায় মেতে আছে। রং লেপছে রং-খসা বিবর্ণ কঙ্কালে। আর কতগুলি বিচিত্র ক্লীবের অক্ষম শয্যায় শুয়ে দেহ উপাসিকার দল, ক্ষুধিত চোখে, নিঃশব্দে কেঁদে কেঁদে ফিরছে পথে ঘাটে। আসলে ক্লীব বাসরের ক্রীতদাসী সব। রত্ন ঐশ্বর্যের পূজারিণী, রক্তমাংসের হৃদয়স্পন্দন স্তব্ধ শব। আত্মসম্মান, শালীনতা, স্বাধিকার একটা চাল মাত্র। শুধু ভাবিনি, যে সমাজের পুরুষশ্রেণী ক্লীব, সেই সমাজের মেয়েরা আসলে সেই ক্লীবের মা-বোন-স্ত্রী।

"কিন্তু এর কোনটাই তো আসলে সত্যি নয়। রং পোশাক শিক্ষা থাকুক, আর না থাকুক, সব কিছুর আড়ালে তো সেই মেয়ে। যে মেয়ে রাণী,

রাজ-রাজেন্দ্রাণী হয়েছে এই সমস্ত শতাব্দীর মার খেয়েও। যে সম্মানে দীপ্তময়ী, অসম্মানে কুপিতা। ঘরের অন্ধ কোণেও অপমানের জ্বালা যার চোখে, যার নিঃশব্দ অভিশাপ থেকে রাষ্ট্র ও সমাজ, নিস্তার নেই কারুর। সেই সত্তা, এমন নিঃশব্দে আড়ালে আড়ালে বেড়েছে যে, তাকে আমরা দেখেও দেখছিনে, চিনেও চিনতে পারছিনে। দৈবাৎ একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা শুধু অদ্ভুত বৈপরীত্য লক্ষ্য করছি, সমালোচনা করছি।

"আজকে সে শুধু তার কাজে নয়, জীবনে, শুধু জীবনে নয় হৃদয়ের সামান্য অসম্মানকেও ক্ষমা করতে রাজী নয়। এ ইব্‌সেনের নোরা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। যে শুধু নাকের ডগায় দরজা বন্ধ করে দেয়না। এ কাঙালিনী, রুদ্রাণী, বৈরাগিনী। যার ঘরের কপাট হাট ক'রে খোলা প'ড়ে থাকে। কিন্তু মনের কপাট তুমি খুলতে পারো না।

"আবার আলাপ হয়ে যাচ্ছে। সুপ্রীতির কথা লিখতে সাহস হচ্ছেনা বলেই এত আলাপের বাড়াবাড়ি। তোমার মনে আছে তো সুপ্রীতিকে?"—

মনে আছে বৈকি! আলাপ হয়েছিল, দেখেছি অনেকবার। সুপ্রীতি যখন ফিফ্‌থ ইয়ারে, নিখিলেশ তখন সিক্‌সথে। একহারা গড়ন ছিল সুপ্রীতির মাথায় ছিল একরাশ থুপি থুপি চুল। একটু যেন চাপা চাপা মনে হ'ত। সহসা দেখলে মনে হতো বুঝি খুব গম্ভীর। আসলে তা নয়। বোধহয়, নিখিলেশের ছায়াসঙ্গিনীর মত দেখেছিলাম বলে মনে হ'ত, সমস্ত গাম্ভীর্যের আড়ালে, তার টানা টানা দুটি চোখের কোণে কী এক রহস্যের তারল্য যেন টলটল করত। সেই টলটলানির গভীরে অনেক কথার ঝিকিমিকি। ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি করে হাসত। কথা শুনত, থাকত চুপচাপ, কিন্তু সব কথাতেই চোখগুলি বড় বড় করে তাকাত। আর একটু বেশি লাল তীব্র ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠত। তারপর মুখ খুললেই দেখা যেত, কোথায় গেছে গাম্ভীর্য! হাসছে কথা বলছে, নির্ঝরের মত চলেছে তর্‌তর্‌ করে। তখন হঠাৎ, মনে হতে পারত, সুপ্রীতি যেন কত হাল্‌কা, কল্‌কল্‌ করে বইছে শুধু। কিন্তু সেই নির্ঝরের মধ্যে একটি তীব্র স্রোত ছিল। সূর্যের আলো লাগা ঝকঝকে এক তীব্র স্রোতস্বিনী।

শুধু চেয়ে থাকা আর নিঃশব্দে হাসির গণ্ডী পার হ'য়ে যখন সে সরল প্রা
কথা বলত ও চলত, তখনো তাকে দেখে মনে হ'ত, কোথায় একটি ভয়ঙ্ক
শক্ত শাণিত ধার রয়েছে, যেখানে হাত দিলে শুধু রক্তপাত হবে।

চিনি বৈকি সুপ্রীতিকে। গরীব ঘরের মেয়ে। অভিভাবক ছিলেন দাদা, যে ভদ্রলোক ওকে চেয়েছিলেন বিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি আপদ বিদায় করতে। ভারী বিশ্রীরকম সন্দেহ করতেন, কটু কথা বলতেন। বিধবা মায়ের মুখ চেয়ে শুধু' বিদায় করে দিতে পারতেন না। ভাই বোনের চরিত্রের কি অদ্ভুত পার্থক্য।
জানি বৈকি! তাদের প্রেমের ব্যাপারও জানতাম। নিখিলেশের কথার সময় সুপ্রীতির চাউনিই তো আমাকে প্রথমে টের পাইয়ে দিয়েছিল। তারপর ওদের বিয়ে হয়েছিল। সুপ্রীতি তখন একটি গার্লস স্কুলে মাস্টারি করছিল। ওরা দুজনে ছাড়া ওদের রক্ষা করার আর কেউ ছিল না। সুপ্রীতির মাস্টারিটা চলে যাওয়ার সংবাদও জানতাম। ওদের স্কুলের কমিটি একজন শিক্ষয়িত্রীর ওপর অবিচার করেছিল। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ওর চাকরিটি খোয়া গেছল। তবু ওরই একটি টিউশনি ছিল বলে, উত্তর কলকাতার এক গরীব পাড়ায় কোনরকমে বাচ্চা নিয়ে টিকেছিল দুজনে। ভয়ানক অভাব যাচ্ছে ওদের, আর ওরা দু'কূল প্লাবিত ঝোড়ো গাঙের মাঝির মত হাল টেনে চলেছে, এ সবই জানতাম।

কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ কী হ'ল। কী হ'ল সুপ্রীতির। কেন এমন করে গান ধরেছে নিখিলেশ। হাতে এত কাজের তাড়া। তবু কী লিখেছে সুপ্রীতির কথা, সেটুকু না পড়ে কাগজের তাড়াটি রাখতে পারলাম না।

"তোমার মনে আছে তো সুপ্রীতিকে? নিশ্চয়ই মনে আছে। কত আলাপ ছিল তোমার সঙ্গে। এও জানতে, আমাদের বিয়ে হয়েছিল, ছেলে হয়েছিল। হয়েছিল মানে হয়েছে বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই। তার সেই রূপের কথাও কি আমাকে লিখতে হবে! তার সেই গর্ভবতী রূপ। তারপরে তার সেই পুত্রবতী রূপ! না, তার সেই অপরূপ রূপের কথা লিখতে আমি অক্ষম। তুমি ভেবে নাও। শুধু এইটুকু বলতে পারি, সুপ্রীতি আমার কাছে অনেক সঙ্কোচ করে হঠাৎ একদিন একটু লঙ্কার আচারের বায়না ধরেছিল।

যেই সেই আচার খাইয়েছে, সে-ই জানে, সে কী রূপ! তখন তার চোখের কোণে অদ্ভুত কালিমা। সে যে সোনার কালিমা! মাঝে মাঝে আমাকে পান এনে দিতে বলত। পান খেয়ে, ঠোঁট লাল করে, চুল এলিয়ে ক্লান্তভাবে বসে সে যখন তার মেয়েদের পরীক্ষার খাতা দেখত, সে রূপ, হায়! লিখন না যায়। তবু বুকটা ভারী টনটন্ করেও উঠত। খাতার পাতা টেনে নিয়ে বলতাম, দাও, আমি খাতা দেখে দিচ্ছি।

ও বলত, না তুমি নম্বর বেশি দিয়ে ফেলবে।

কেন?

ও একটু টিপে হেসে বলত, শত হলেও মেয়েদের খাতা তো। উপযুক্ত নম্বর দিতে তোমার হাত সরবে না।

আমি বলতাম, মেয়ে হলেও স্কুলের বালিকামাত্র এই মেয়েরা।

সুপ্রাতি বলত, তবু অপত্য স্নেহের একটু বাড়াবাড়ি হতে পারে তো। বলে হেসে খাতাগুলি বাড়িয়ে দিয়ে, কাৎ হয়ে শুয়ে আমাকে দেখত। আমার আর খাতা দেখা হ'ত না। আর কিছু দেখতাম। আর কোন রূপ, যে রূপের কথা মনে করতেও আমার হৃৎপিণ্ড শুকিয়ে উঠছে আজ।

"তুমি ভাবছ, এ কি বিবাহোত্তর প্রেমের কাহিনী শোনাতে বসলাম আমি। তাই তো ভেবেছিলাম, এমন একটি প্রেমের ফল আমি আর সুপ্রীতি বসে বসে ভরে তুলছি, যখন তাতে ফুট ধরেছে, ফাট লেগেছে, শুকু শুকু হয়েছে, তখনো চুরি করে রস এনে দিয়েছে তার গোড়ায়। নিজের হৃদ্‌পিণ্ডটি হাতে নিয়ে চটকেছি। ভেবেছিলাম সেইরকমই, হৃদ্‌পিণ্ডটি চটকে চটকে বুঝি তাতে রস দিয়ে ভরে রাখবার চেষ্টা করেছি। আসলে বিবাহোত্তর একটি ব্যাপারকে নিশিদিন কেবলি পোকার মত কাটা হয়েছে, ছেঁড়া হয়েছে। যখন ওপরের আস্তরণটি আর ধরে রাখা যায়নি, তখন ভেতরের অন্ধকার শূন্য গুহাটা হাঁ করে বেরিয়ে পড়েছে। কী ভয়াবহ শূন্য। যে শূন্যের এপার নেই, ওপার নেই।

"বিয়ের পর ছিলাম মধ্য কলকাতায় একটি মাঝারি গোছের পাড়ায়। সুপ্রীতিকে পাওয়ার জন্য আমাকে তেমন কোন মূল্য দিতে হয়নি। 'তেমন কোন' কেন, কোন মূল্যই দিতে হয়নি। তুমি জানতে, বাবা মা ছিলেন

না আমার বহুদিন। চোৎখণ্ডের অর্থাৎ চৈত্র খণ্ডের এক অখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে আমি। সেখানে গিয়ে আমার বাবার নামটা বললে লোকে একটু ভেবে স্মরণ করে বলতে পারবে, 'ও, তুমি নগেন্দ্র গাঙ্গুলির কথা বলছ? তা সে তো অনেকদিন মারা গেছে। এক ভাই ছিল যোগেন্দ্র, আর ছেলে একটি ছিল। সেই ছেলে তো খুড়োর সঙ্গে আজ এক যুগের উপর কলকাতায় বাস করছে। শুনছি, ছেলেটি নাকি লেখাপড়া করছে। আর যোগেন্দ্র গাঙ্গুলিরও চোৎখণ্ডে আর কিছু নেই, আসেও না। কিছু নেই, আসবে কেন। এখন কলকাতারই বাসিন্দে বনে গেছে।'

"এই হচ্ছে মোটমাট আমার খাঁটি বাংলা পরিচয়। কাকা এক কেরানী। সারাদিন পরে বাড়ি আসেন, বাচ্চাগুলিকে শাপশাপান্ত করেন, তারপরে চা সহযোগে কিঞ্চিৎ আফিম সেবন করে ঝিমোন! আশা ছিল, দিগ্‌গজ ভাইপোটি ভবিষ্যতে কাজ দেবে। যখন একদিন সন্ধ্যাবেলায় জমাট মৌতাতের সময় শুনলেন, আমি বিয়ে করব, ভদ্রলোকের নেশা গেল ছুটে। প্রথমে একটু উল্লসিত হয়েই বললেন, অ্যাঁ? চাকরি হয়েছে বুঝি কোথাও?

বললাম, আজ্ঞে না।

মুখখানি ভয়ঙ্কর হ'ল। বুঝলাম, পয়সাওয়ালা মৌতাতটুকু আমি মাটি করেছি। বললেন, তবে? শুধু শুধু বিয়ে?

হ্যাঁ।

কাকীমাকে ডাকতেন মেজবৌ বলে। হঠাৎ চীৎকার করে ডেকে উঠলেন, মেজবৌ।

কাকীমা এলেন ছুটে। কাকা বললেন, তোমার ভাসুরপোকে আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যেতে বল।

বোধহয় নিজে বললে, মৌতাতের আর একটু ক্ষতি হ'ত। ওঁর কোন দোষ নেই। মুখে না বুঝলেও মনে মনে তা বুঝেছিলাম, কাকাকে কতখানি নিরাশ করেছি আমি। সেই সন্ধ্যাতেই বিদায় হলাম। আমি কিছু হারাইনি বরং অনেকখানি পেয়েছিলাম। কী যে পেয়েছিলাম, তা আজ খুঁটিয়ে বলার সাহসও বোধহয় আমার নেই!

"সুপ্রীতির পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত একটি বর্ণনা আমি দিতে পারি। তার সেই চোখের, তার চুলের, তার হাসির, তার সেই কেমন একটু বৈরাগিনী ভাবের, যে জ্ঞান বৈরাগ্যের আশে পাশে কেবলি খানিকটা চোরা রং-এর ছিটা ঝলকে উঠত এদিকে ওদিকে, যে বৈরাগ্যের কপনি খুলে তার অজস্রধারা রং-এর ছিটায় আমার চোখ মুখ ভরে গেছে, যে রং মেখে আমি ভারী গৌরব করে বেড়িয়েছি রাস্তায়, যেন এমন হোলি আর কেউ কোনদিন খেলেনি। তার সেই বিচিত্র রং-মাখা হাসি, তার সেই একহারা শরীর, যার প্রতিটি ধাপ, চড়াই-উৎরাই চেনা ও জানা আমার, তার সব বর্ণনা আমি দিতে পারি। কিন্তু সে তো কখনো ঠিক হবে না, নিখুঁৎ হবে না। জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ, নয়ন না তিরপত ভেল। বাইরেটা দেখেছি, ভেতরের কপাট কত পেয়েছি খোলা। ভেতরের কপাটের আপাত অন্ধকার দেখে কেবল ভয়ই পেয়েছি। মধু পিয়াসী মৌমাছির মত মাতাল হয়ে শুধু গুন্‌গুন্‌ করেছি, সেই অপরূপকে তো দেখিনি। আমি কেমন করে তার বর্ণনা দেব? যা আমি পেয়েছিলাম, তা যে আমার চেনা নয়।

"আবার সেই প্রেমেরই কথা আসছে ঘুরে ফিরে। এও আলাপের হেরফের। তবু একটু বলি। আমাদের বিয়ের জীবনের প্রথম দিকে তুমি এসেছিলে বলেছিলে, আমাকে নয়, সুপ্রীতিকে, বেশ জমে আছো।

সুপ্রীতি তোমাকে বলেছিল, আমার দোষ নয়, ওকে বল।

ওকে অর্থাৎ আমাকে। আর জমে থাকা যেন দোষ। তুমি তাড়াতাড়ি বলেছিলে, দোষটা কারুরই নয়, নিষ্পাপ যৌবনের কারবারই এমনি।

আশ্চর্য! কেন তুমি নিষ্পাপ যৌবন বলেছিলে। যৌবন কখন পাপ করে তবে? আমি সত্যি আজো ঠিক জানিনে, যৌবনের পাপ কী? জানি শুধু এইটুকু, ভীরু হয়ে উঠেছিল আমার যৌবন। ভীরু, দুর্বল, দিশেহারা। ভীরু যৌবনই তবে পাপ!

"যাক, তবু একটু বলি। আমি একটু বেশি ভদ্রলোক ছিলাম। যাকে বলে ফর্ম্যাল। সেটা বৈবয়িক বটে, কিন্তু শ্রেণীচরিত্র নয়। ফর্ম্যালিটিটক আমার

পরের বাড়িতে পা টিপে টিপে মানুষ হওয়ার সঙ্কোচ। ওটা আমার চরিত্রের দোষ।

"তাই প্রথম যখন সুপ্রীতি আর আমি হাত ধরাধরি করে এলাম আমাদের কোটরে, তখনো ভয় হতে লাগল, কখন সুপ্রীতি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলবে, 'ছেড়ে দাও, এটি আমার হাত।'

কিন্তু সুপ্রীতি ঠোঁট টিপে হেসে বললে, হাতটা আরেকটু জোরে ধর, নইলে পড়ে যাব যে!

আমি তাড়াতাড়ি আরো জোরে ধরলাম। সুপ্রীতি বলল, আরো জোরে। আরো জোরে ধরলাম। ব্যথা পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল সুপ্রীতি। বললে, বাব্বা! কী লোক! নিজের স্ত্রীকে একটু ভালো করে ধরতেও পারো না? তোমার এত ভয় ভদ্রতা কিসের শুনি? মা মুখ ফিরিয়ে রইল, দাদা গালাগাল দিলে। সব ছেড়ে যে তোমার কাছে এলাম, বুঝি এমনি ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকব বলে?

বলতে বলতে হাসতে হাসতেও ওর চোখ উঠল ছলছল্ ক'রে। অমনি আমার চোৎখণ্ডের শৈশব এল যেন ফিরে। তাকিয়ে দেখি. কলেজ স্ট্রীট দিয়ে হাঁটা সেই সুপ্রীতি বৈরাগিনীর মুখে রং দিয়ে রসকলি আঁকা। থুপি থুপি চুলগুলি কষে দিলাম নেড়ে আর ও গান গেয়ে উঠল। কোন বিয়েতে, বাসরে, ফুলশয্যেয় এমন গানটি তো কাউকে গাইতে শুনিনি। সুপ্রীতি গাইলে,

আমি কী গান গাব যে
ভেবে না পাই।
মেঘলা আকাশে, উতলা বাতাসে
খুঁজে বেড়াই।

"এ গানের সুরে কত উল্লাস। যেন দমকে দমকে উল্লাস বাড়তেই থাকে। তবু এ উল্লাসের সুরে এক বিস্মিত বেদনার আভাস। সুপ্রীতি কোন গৃহকোণের গান গাইলে না। তার প্রেম, ভালোবাসা, তার ঘর সবকিছু নিয়ে, আমার হাত ধরে সে যেন গানের সুরে বিশ্বের এক অন্য সংসারে গেল চলে।

"কিন্তু হাত ধরাধরি করে দিন কাটে না। গানের সব সুর শেষ পর্যন্ত নীরব হয়ে ফিরে আসে ঘরের কোণে। ঘরের কোণে যখন তাকিয়ে দেখি, জানালা দিয়ে রোদ এসেছে ঘরের মেঝেয়। সুপ্রীতি নেই ঘরে। সে চলে গেছে তার কাজে। বুকের মধ্যে একটি অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করি। দুপুর বেলা আসে চাঁপা। একটি চোদ্দ পনর বছরের মেয়ে। আমাদের ঝি। কাজ কিছু নয়; আমাদের অনুপস্থিতিতে সারাদিন বাড়িতে থাকাটাই ওর কাজ। ঘরকন্নার কাজ এমন কিছু ছিল না। একটু ঝাঁটপাট দিয়ে রাখা, একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা আর নীচের ভাড়াটেদের সঙ্গে গল্প করা।

"চাঁপা মেয়েটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কারণ বুঝতাম ওর অবাক হওয়ার। ও মনে মনে অবাক হয়ে ভাবে, এ কেমন মিনসেরে বাবা। মিনসের বৌ যায় রাত পোহালে রোজগার করতে আর এ বসে আছে ঘরের কোণে।

"তাই চাঁপা এলে ব্যস্ত হয়ে উঠি। যেন কত আমার কাজ আছে বাইরে। কিন্তু বাইরে এসেই রাস্তার মোড়ে দাঁড়াই আড়ষ্ট হয়ে। চাঁপা যতখানি ভাবে, তার চেয়ে যে অনেক বেশি আমার বুকের ভার। সুপ্রীতি যখন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে, স্নান করে, চুল এলিয়ে এসে দাঁড়ায়, তখনো আমার শরীর থেকে গত রাতের জড়িমা কাটে না। সুপ্রীতি যখন চুল আঁচড়ে খেয়ে বেরোয়, তখন আমি আঁচল টেনে ধরি। ও হঠাৎ বুকের কাছে আরো ঘন হয়ে বলে, ছেড়ে দাও, নইলে লোভে পড়ে সত্যি যেতে পারব না কিন্তু।

"লোভ ওর সত্যি ছিল কিনা কোনদিন জানিনে। তবু নতুন বিয়ের লজ্জা-না-ভাঙা একটি বিচিত্র চাপা খুশির হাসির ধারে ধারে, একটু বিরহের বিষণ্ণতা দেখা দেয় হঠাৎ। বুকের কাছে লেপটে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। ওর বুকের ধুকধুকির তালে তালে যেন ঘড়ির টিক টিক শব্দ। সময় যায়, সময় নেই!

"আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে মুখ তুলে, ও করুণ মিষ্টি গলায় বলে, এবার যাই, কেমন? আমি তাড়াতাড়ি ফিরব। তুমিও রাত করোনা যেন।

তারপর কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমার বন্ধন শিথিল করে দেয়। ও চলে যায়। আর আমি নিঃসঙ্গ পুরুষ পাখীটার মত ঘরের চারপাশে বেড়াই

ঘুরে। ডাকতে পারিনে, সত্যি সত্যি পাখী নই বলে। কিন্তু মনের পাখীটা হাহাকার করতেই থাকে। বাসাটা আসে হাঁ করে গিলতে। আর যেমনি চাঁপা আসে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।

"বেরিয়ে এসে, বুকের ভারটা আরো বাড়ে। কাজ [illegible]ই। সুপ্রীতির জীবনটুকু সবদিক দিয়ে ভরপুর। যৌবনের পুনি[illegible] কাজ, সেই কাজ ওকে মহৎ ও মোহিনী, দুই-ই করেছে। আর যুদ্ধোত্তর দেশের সমস্ত অকাজের [illegible] রইল পড়ে আমার জন্য। যেখানে যাই, কাজ নেই। কাজ নেই। ফিরে আসি অন্ধকার মুখে।

"আমার অন্ধকার মুখ। সেও যে আবার সুপ্রীতির [illegible] শুধু নয়, অসম্মান। এ জীবনটাকে যে সে সত্যি চ্যালেঞ্জ হিসাবেই গ্রহণ করেছিল। যে চ্যালেঞ্জ মেয়েরা গ্রহণ করেছে আমাদের ইতিহাসের কাল থেকে। এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে।

"ও আমাকে বকতে থাকে, রাগ করে। বলে, নিশ্চয় তুমি আজ অতিরিক্ত ঘুরেছ! কী দরকার তার। জলে তো পড়ে নেই আমরা। যা হবার, তা ধীরে সুস্থে হবে। কে তোমাকে ছুটোছুটি করতে বলেছে।

"মুখে যা-ই বলি, মনের মধ্যে স্বস্তি সুখে ভরে ওঠে। সাহস পাই অনেকখানি।

"তারপরে, ওর রূপ বদলাল। নতুন রূপ হ'ল। ভার হ'ল শরীর। যেন টানের কাল গিয়ে মাঠে আষাঢ় নেমেছে। তখন আমার ছটফটানি বাড়ল আরো। কী করি। এই অপরূপের মধ্যে দেখা দিল অবসন্নতা। ঠোঁট দুটি আরও লাল হয়েছে। জোয়ারের টাবুটুবু স্থির গঙ্গা কিন্তু চোখের কোলে ক্লান্তির কালিমা। কালিমাও এত সুন্দর হয়! এই সময়ে, যখন কথা ছিল ঘরের কাজে কর্মের মধ্যে সুপ্রীতি নানান স্বপ্ন দেখবে, হাসবে আপন মনে, ছোট ছোট দুটি জমা তৈরি করবে, সেই সময়ে ওকে যেতে হয় স্কুলে।

আমি বলি, তোমার সঙ্গে যাব।

ও বলে না, সে আমার ভারী লজ্জা করবে। সবাই আমাকে দেখেই আবার তোমাকে দেখবে।

সত্যি, এ বড় লজ্জার কথা। ঠাট্টা না করে থাকতে পারিনে। সুপ্রীতির শরীরে মা হওয়ার লক্ষণ দেখে, পাশে আমাকে দেখলে যে লোকে বুঝতে পারবে, সে যার মা হতে যাচ্ছে আমি তার পিতা।

কিন্তু বড় ভয়। নিজের মনে ক্ষোভ আর লজ্জা নিজেকে ফাঁকি দিতে পারছে না। শেষ মুহূর্তে দীর্ঘদিনের ছুটি পেল ও মাইনেসহ।

"ছেলে হ'ল। সুপ্রীতির মত। ভারী মিষ্টি। মিঠে মিঠে করে ওর নাম হয়ে গেল মিঠু। আর মিঠুকে নিয়ে কাটাতে গিয়ে আমি সাময়িকভাবে ভুলেই গেছলাম সব কিছু। চাঁপার কাজ বাড়ল। সুপ্রীতির অনুপস্থিতে অনূঢ়া চাঁপা হ'ল মিঠুর পালিকা মা। চাঁপা আমাকে যতই পুরুষ হিসাবে বিদ্বেষের চোখে দেখুক, মিঠু যেন ওর জীবনের প্রথম সম্পদ। চাঁপার মনস্তত্ত্ব ঘাঁটা আমার কর্ম নয়। কিন্তু আমি একটু আড়াল হলেই দেখেছি, ছেলেটাকে নিয়ে ও কত কীর্তি-ই না করে। নিজে ঘোমটা দেবে, ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে ঘুম পাড়াবে মিঠুকে। রাজ্যের গল্প ফেঁদে বসবে সেই শিশুর কাছে, যার এখনো নজর ফোটেনি ভাল করে। রাগ হলে বকবে, তারপর নিজেও হঠাৎ কাঁদতে বসবে চাঁপা। কেননা, এ দস্যি ছেলে নিয়ে সে আর পারে না। মা হওয়ার সব কাজগুলি চাঁপা মনে ও শরীরে পালন করে। ভাবো, কুমারী চাঁপা তার শরীর দিয়ে মাতৃত্ব পালন করে। কিন্তু একটি কথা সে আমার মিঠুকে বারবার বলে আমার আড়ালে। বলে, খবরদার, তোর ওই নেকাপড়া জানা কুড়ে বাপের মত যেন হোসনি। তা হলে একেবারে মেরে শেষ করব। বলে, বাবা বাবা! কী কুড়ের বাদশা তোর বাবা। দুচক্ষে দেখতে পারিনে অমন ঘরে বসে থাকা পুরুষ। অমন নেকাপড়ার মুখে ছাই।

"কোন গুণ নেই যার, তার ছারগুণ আছে। আড়াল থেকে চাঁপার কথা শুনে আমার আবার রাগ হ'ত। রাগের মূলে তো আমার দুর্বলতা। আমার মনে হয়, সমস্ত সংসারটা আমাকে দেখছে চাঁপারই চোখে। চাঁপা আমাকে হয়তো ভালবাসে না। লেখাপড়া শেখেনি, তাই মনের কথা ওর মুখে আটকায় না। কিন্তু সুপ্রীতি! ভালবেসেও কি তার মনে, তার মনের গোপন গুহায় আর একটি সুপ্রীতি চাঁপার মত এমনি বলে না? যে সুপ্রীতি এম, এ, পাশ

করেনি, শুধু একটি বউ, সেই সুপ্রীতিও কি মনে মনে একবারও বলে না এসব কথা।

এই বেকার জীবনে স্ত্রৈজিৎ হ'য়ে উঠেছিলাম কিনা জানিনে। এত দুর্ভাগ্যের মাঝেও হারিয়ে ছিলাম সুপ্রীতির রূপের মাঝে। সব ভার পেরিয়ে, সুপ্রীতি তখন ফাল্গুনের গঙ্গা। সে তখন আরো দীপ্ত, তীক্ষ্ণ। অনেক পালক ছেড়ে নতুন পালকে হালকা সেজেছে হালকা হ'য়ে।

"তারপর এল সেই দিন। সেই দিন যেদিন সুপ্রীতির চা... দারুণ মার খেয়ে চুপসে গেছে। দেখলাম, তার মুখ শুকিয়ে গেছে। চোখের কোণে কালি, মুখে ভীরু বিষণ্ণ অপ্রস্তুত হাসি। বিয়ের পর এমন মু... কোনদিন দেখিনি। এসে আমাকে বললে, তুমি বড় রাগ করবে আজ আমার ওপর।

বললাম, কেন? কী হয়েছে সুপ্রীতি?

অপরাধীর সুরে বলল, চাকরিটা গেল।

এতদিনে মনে হ'ল, সত্যি আমার বাসাটা কাঁপছে। কিন্তু সেই কাঁপুনি একটুও টের পেতে দিলাম না তাকে। সুপ্রীতি বলল, কিছুদিন থেকেই স্কুল কমিটি আমাদের এক শিক্ষয়িত্রী কনকদির উপর বড় অত্যাচার করছিল। তোমাকে বলেছিলাম সেসব কথা। কনকদির বয়স হয়েছে। এ অবস্থায় বেচারির খাটুনি বাড়িয়ে মাইনে কমিয়ে দিয়েছিল। প্রথম থেকেই ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি। সবাই মিলে প্রতিবাদ করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত কমিটি আমাকেই বিদায় করল।

শুনতেও আমার বুক কাঁপছে। আমার ভিতরের প্রতিটি তন্ত্রীকে সজাগ রেখে, অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছি আমার সমস্ত অঙ্গভঙ্গি।

"সুপ্রীতিকে সবটুকু চিনতাম, সেকথা বলার সাহস আমার নেই। কিন্তু যতটুকু জেনেছিলাম, তাতে বুঝেছিলাম, সে তার উপযুক্ত কাজই করেছে। বোধহয় এইটিই আসল সুপ্রীতি, যে কনকদির কষ্ট চোখের সামনে দেখে কাজ করতে পারবে না, হাসতে পারবে না। এমন কি বাড়ি এসে ভাল করে খেতে পারবে না, ছেলেকে আদর করতে পারবে না, আমার সঙ্গে পারবে না প্রেমের খুনসুটি করতে। পারেও নি। কয়েকদিন থেকেই তাই ওকে বড়

অন্যমনস্ক লাগছিল। হ্যাঁ, এই তো আসল সুপ্রীতি। এই যুগের এক মেয়ে, যে চোখের সামনে অন্যায় ও পাপ দেখে স্থির থাকতে পারেনা। সাধারণ ভাবে বাস্তববুদ্ধি বিবর্জিত এ এক বিচিত্র ইমোশনের কারসাজি বলে মনে হতে পারে। বোধ হতে পারে সেন্টিমেন্টালিজম। কিন্তু অন্যায় ও পাপকে যে গোড়া থেকেই ঘৃণা করতে শিখেছে, তার কাছে তো অন্যায়ের ছোট বড় নেই। তার ওপরে সে যে মেয়ে। অসম্মান করে বলছিনে। অনেকে ট্যাকটফুলি ম্যানেজের কথা বলে। কিন্তু সুপ্রীতি মেয়ে হয়ে মেয়েলি ইমোশন ছাড়বে কেমন করে। এ যে আমারই সম্মান এবং গৌরব।

"ভয়ের মুখ চেপে ওকে হাত ধরে কাছে টেনে এনে বললাম, 'সুপ্রীতি, সামনে বিপদের ঝুঁকি হয়তো আছে। কিন্তু এ ছাড়া তুমি আর কী করতে পারতে। সব ভয়ের মধ্যেও আমার বুক ভরে উঠেছে, তোমার সাহসের বরাভয়ে। আমার স্ত্রী হয়ে আমাকে অনেক কিছু দিলে তুমি এই থেকে।

ও বললে, কিন্তু—

বললাম, কোন কিন্তু নয় সুপ্রীতি। এই বিপদের মধ্যেও আমার সব সংশয় গ্লানিকে তুচ্ছ করে দিলে। যা করেছ, তা না করলেই আমার কষ্ট হত বেশি।

ঠিকই। তবু, আমি তো মেয়ে নই। সুপ্রীতি যে মেয়ে।

বলল, চুপ করে থাকতে পারলাম না। কিন্তু এবার কী হবে?

"কিন্তু এবার কী হবে? কথাটি যেন দারুণ বিভীষিকার মত, বিদ্রূপ করে চিবিয়ে চিবিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, এবার কী হবে? এই তো প্রথম শুনলাম একথা। সুপ্রীতির মুখ থেকে শুনলাম, এবার কী হবে! সারা বিশ্বটিকে এত অসহায় আমার কোনদিন মনে হয়নি।

"এইবার আমার পালা শুরু হ'ল যেন। ওই একটি কথা আমাকে বলে দিল, এবার আমাকে কিছু করতে হবে।

সেই সারা বিশ্ব আমারই বিশ্ব। আমারই সংশয়বাদী ভীরু দুর্বল ছায়া সেই বিশ্বে। সেখানে নিশিদিন এক ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল, এবার কী হবে! কী হবে! কী হবে!

"পাহাড়ী বন্যার মত তরতর্ ক'রে নামতে নামতে এক জায়গায় এসে ঠেকল। সেই ঠেক্‌নো সুপ্রীতির একটি ট্যুইশানি। তখনো একটি পঞ্চাশ টাকার ট্যুইশানি ছিল। মধ্য-কলকাতার বাস ছেড়ে চলে যেতে হ'ল আরো উত্তরের শহরতলী ঘেঁষে এক গরীব পাড়ায়। মাঝে মাঝে আসেন কনকদি। আমার সব ভদ্রতা ও সহনশীলতা নিয়েও এই মহিলাটিকে আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

"যত কাজের জন্য ঘুরি, যত ব্যর্থ হই, ততই কাকার বাড়িতে টিপে টিপে মানুষ হওয়া আমার চিরদিনের দুর্বল ভীরু সেই জীবটি, সব দুরবস্থার জন্য মনের মধ্যে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে হীন বিতর্ক জুড়ে দিতে লাগল। কী রকমের হীনতা, জানো? যেমন ধর কাকার ছেলেটা খায় বেশী, শোয় ভাল। ওর জামাকাপড় যেন বেশী আমার চেয়ে। স্কুল কলেজে আমিও পাশ করি, সেও পাশ করে, তবু কাকা কাকীমার সোহাগ ওর উপরেই যেন বেশী। এসব কুটতর্ক কি ছিল আমার মধ্যে? নিশ্চয়ই ছিল। এসব দিকে আমি চোখ রাখতাম। পরের বাড়িতে মানুষ হওয়ার এদিকটাই আমাকে আশ্রয় করেছিল, মনে মনে জানতাম।

"আজ মনে হচ্ছে, আমি যে আদর্শবাদী ছিলাম, তার কারণ আমার ছোট অন্তঃকরণের অতৃপ্তি। কিন্তু আদর্শবাদীর অন্তর তো বড়, দেশ দশ ও সমাজ, সব কিছুর ভেতর দিয়ে মনের যে বাসনা, চিন্তা ও অধ্যবসায়, তাই তো আদর্শ। কিন্তু কেরানী কাকার এই ভাইপোটার আদর্শবাদী হওয়ার পেছনে শুধু ঘরোয়া হিংসে। জল না পাওয়া, স্বাভাবিক ভাবে না-বাড়া চারা গাছের দুর্বলতা। *অবশ্য, নিজের মনের কষ্টিপাথরে দাগ কাটা এমন আদর্শবাদীও জীবনে অনেক দেখেছি। তুমি সাহিত্যিক। সেই অক্ষম, ভীরু, পরশ্রীকাতর আদর্শবাদীকে* তোমাকে আমি আর বেশি চেনাব কী করে! বোধহয় রাজনীতিতে অধৈর্যতার লক্ষণও আমার সেইদিক থেকেই এসেছিল।

"আমার সব রাগ গিয়ে পড়ল ওই কনকদির ওপর। তিনি এখনো চাকরি করেন। দিব্যি আসেন, দুঃখ প্রকাশ করেন, আর সুপ্রীতিকে আড়ালে পেলে চোখের জল ফেলে কিছু টাকা গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সুপ্রীতি কিছুতেই

নিতে পারে না। কনকদি কেঁদে ফেলেন। কিন্তু আমার রাগ বাড়তেই থাকে।

"তারপর আমি ধার করতে শিখলাম! ধার করি বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে, শোধ দিতে পারিনে। তারাও অবিশ্বাস করতে লাগল, হতাশ হতে লাগল। কিন্তু কাজ! কাজ কোথায় আছে!

"আমি হন্যে হয়ে উঠলাম। সুপ্রীতি ঠোঁট টিপে রইল। আমার দুরবস্থা দেখে, ওর বুক ফাটছে, তবু ঠোঁট টিপে আছে। মুখ ফুটছে দেবে না। মিঠুকে বুকে চেপে ও কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিল, তবু একবারও বলতে পারছেনা, থাক আজকে বেরিওনা। বলবার যে ওর উপায় নেই।

"সুপ্রীতি ভাবছিল এরকম। আর আমি পাগল হচ্ছিলাম ওর জন্যে। ওর অদ্ভুত রক্তাভ সেই তীব্র ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসি বিদায় নিয়েছে। এটা আবার কোন পুরুষের লক্ষণ জানিনে, কিন্তু আমার জীবনের সবখানি ভরেছিল, রাঙা করে রেখেছিল আমি ওকে পেয়েছিলাম বলে। ওর সেই রাজেন্দ্রাণী মূর্তি কোথায় গেল।

"সারাদিন, কাজের জন্য, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে প্রতিটি দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে এসে আমি আমার সেই রাজেন্দ্রাণীকে খুঁজি। সোহাগের ছলে, আদরের আড়ালে, কথার আনাচে কানাচে, ব্যথার মধ্যেও তাকে খুঁজি। যত খুঁজি, আর যত পাইনে, ততই আমি আমার সামান্য শক্তি হারিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠি। আসলে সুপ্রীতি আমাকে কোনরকম মিথ্যা স্তোক দিতে চায়নি। তাই বুকের মধ্যে ক্ষয় হলেও, ও খোঁচা খাওয়া শামুকের মত ছিল গুটিয়ে। ভাঙতে হলে ওপরের শক্ত খোলসটাই ওর ভেঙে ফেলতে হয়। যার পরে ওর বেঁচে থাকার আর কোন উপায়ই থাকবে না। তাই আমি ওই শক্ত খোলসটার ওপরেই আমার সব স্নেহ ভালোবাসা ঢেলে দিতে লাগলাম।

"ভেবো না যেন, সুপ্রীতি হাসেনা। হাসে, কিন্তু এ সেই রাজেন্দ্রাণীর হাসি নয়। বৈরাগিনীর হাসিও নয়, তার মধ্যে একটি অপ্রস্তুত ভীরুতা ছিল। তার ভালবাসায়, সোহাগে, সবকিছুতে। এমন কি, মিঠুর প্রতিও।

"আমি ফিরে এলে, নিজে এসে টেনে নেয় বুকের কাছে। আমার গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। কিন্তু বলে না, কেন এত কষ্ট করছ? না বলুক, তবু কী যেন হারিয়ে গেছে। আর থেকে থেকে বলে, কী যে হবে!

"কী যে হবে! কী হবে! পঞ্চাশটাকার ট্যুইশানিটা কোনরকমেই টানতে পারেনা আর। চাঁপাটা মুখের ওপরেই আজকাল কথা বলে। ওকে কিছু বলতে পারি নে। কেননা, দুপুর থেকে সন্ধে অবধি, সুপ্রীতি না ফিরে আসা পর্যন্ত ও-ই মিঠুকে নিয়ে। মাইনে পাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ঘরের খেয়েও ও যে থাকে, সে শুধুমাত্র মিঠুর জন্য। কিন্তু কেন জানিনে, চাঁপার চিমটি-কাটা কথাগুলি আমার আজকাল সহ্য হয়ে গেছে।

"অনেকদিন তো হয়ে গেল। নিখিলেশ গাঙ্গুলির জন্য কি কোন চাকরিই নেই কোথাও। একদিন একটা ম্যাট্রিক পাশ ছেলে, আমার সামনেই আর একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কী অপমানটাই করে গেল এই চাকরি না পাওয়া শিক্ষিত ম[illegible]দের। ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ করেও, দুশো টাকা বেতনে সওদাগরি অফিসে চাকরি করে। অপমান করার অধিকার ওর আছে বৈকি। বললে, যত সব ভ্যাদমপঞ্চার দল। এদের দিয়ে কিছুই হবে না।

"তখনো পাগল হয়ে টেনে নিই সুপ্রীতিকে। ওইটিই তো আমার জীবনের সবচেয়ে ভীরুতা ও দুর্বলতা। আমি আমার ছোট মন মনিয়ে কেবলই ভাবি সুপ্রীতি আমাকে দুর্বল ভাবছে, আমি ওর কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছি। কিংবা আমি হয়তো ওকে হারাব। তাই বাইরে থেকে ছুটে এসে আগে ওকে বলি, হল না আজো সুপ্রীতি।

"সুপ্রীতি তেমনি হাসে। বলে, তাই তা। কী যে হবে!

"হবে শব্দের ওই দুর্বিসহ অন্ধকার পর্দাটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমি বলি, কোথায় কোথায় গিয়েছি আজ, কোথায় কী হয়েছে।।

সুপ্রীতিও বলে। চাঁপাকে বাড়িতে রেখে আমরা দুজনেই বেরুই। গলির মোড়ে গিয়ে, দুজনে আবার ফিরে তাকাই।

"আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্রোত ও তরঙ্গ, ওঠা-নামা, সবকিছু ওইটুকু মধ্যে এসে ঠেকেছিল। আমরা দুজনে বলাবলি ক'রে বেরুতাম, কে কোথা যাব। কোথায় কী বলব।

"যখন বলাবলি করতাম, তখন আশার উত্তাপে ধিকিধিকি জ্বলত আমাদে বুক। আমরা দুটিতে যেন অন্তরঙ্গ সেনাপতি ও সৈনিক। সেনাপতি কখনো সুপ্রীতি, কখনো আমি। বসে বসে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার নানা পন্থা বের করতাম খুঁজে।

ও বলত, অমুক জায়গার ইণ্টারভিউতে গিয়ে তুমি এই কথা ব'লো।

আমি বলতাম ওকে, তুমি ব'লো এই কথা।

বলতে বলতে সব ভয়শূন্য হ'য়ে উঠত। রোজই মনে হত, আজ শূন্য হাতে ফিরব না। তবু সংশয়ের ছায়াটি আসত নিঃশব্দে, অদৃশ্যে পা টিপে টিপে। বেরুবার পূর্ব মুহূর্তে হয় তো সুপ্রীতি দুটি আঙুল বাড়িয়ে বলত, ধর তো একটি? এত তাগ্‌বাগ্‌ কষে শেষ পর্যন্ত ওই দুটি আঙুলের ভয়ার্ত স্খলিত হাসি মাখানো পরীক্ষা। ওই দুটি আঙুলে এসে ঠেকত সমস্ত জয় পরাজয়ের ভবিষ্যৎ।

"একটি ধরতেই হত। কখনো সুপ্রীতির মুখে হাসি ফুটে উঠত। বলত, আজ নিশ্চিত কিছু হবে। কখনো চকিত ভয় ও নিরাশা চেপে আড়ষ্ট হেসে বলত, হল না।

"আচ্ছা দেখি তবু কী হয়।

"আঙুলের গোণায় আমাদের কারুর বিশ্বাস ছিল না। ওটা আসলে সাহসে বুক বেঁধে বেরুনো। আমার আঙুল ধরানোর ভবিষ্যৎ গোণায় সাহস ছিল না। এমনি করে বেরুতাম। গলির মোড়ে এসে দুজনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ও বলত, আচ্ছা, এসো তা হলে?

আমি বলতাম, তুমি এসো আগে।

"দুজনেই দুজনকে বিদায় দেওয়ার জন্যে রোজ দাঁড়াই। শেষ পর্যন্ত আমাকে যেতে হত আগে। তারপরে সুপ্রীতি। হেসে বিদায় নিই দুজনে দুজনের কাছ থেকে।

"একদিন আর সুপ্রীতি ফিরে তাকাল না। বুকটার মধ্যে ... করে উঠল দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, এবার নিশ্চয় ফিরে তেমনি করে একটু হেসে ঘাড় হেলিয়ে চলে যাবে। কিন্তু মোড়ের বাঁকে হারিয়ে গেল। তবু ফিরে তাকাল না। আসলে, সেদিন আশা নিরাশায় ডুবেছিল ওর মন, এক জায়গায় ইন্টারভিউর ব্যাপারে। আমি তা বুঝিনি।

"কিন্তু তারপরের দিনও তাকাল না, কোনদিনই আর নয়। আমার বুক ভরে উঠেছিল ভয় ও ব্যথায়, আর, প্রকৃতপক্ষে সুপ্রীতির মন হারিয়ে গিয়েছিল দুশ্চিন্তায়। কিন্তু আমি আমার ছোট মন নিয়ে তা তো বুঝতে পারিনি। আমি শুধু বিরাগের আশঙ্কাই করছিলাম।

"জীবনের মান সম্মান ক্ষুধাটা বড় হল না। বড় হয়ে রইল শুধু সুপ্রীতি। সেটা আবার কেমনতরো পুরুষের মন। সে এক ভাববিলাসী ছোট মনের পুরুষ। আসলে আমার প্রেম স্বার্থপর। এ এক স্বার্থপর প্রেমের নীচতা। সুপ্রীতি তো বড় থাকবেই, কিন্তু তার প্রেমের জন্য আমার ভীরুতা ও স্বার্থপরতা এসেছে মনে। মনে হ'ল, সুপ্রীতির জন্য, আমি সবই করতে পারি। বিশ্বসংসারে আর কিছু চাইনে। বোধহয় বোঝাতে পারলাম না তোমাকে। এ যেন সেই প্রেম, যাকে রক্ষা করবার জন্য, এ বিশ্বসংসারে সর্বচরাচরে কোনদিকে চোখ মেলে একবার দেখতেও চাইনি।

"আমি আকাশ মাঠ মাটি, গাছপালা পাখী, সবই তো ভালবাসতাম। আমি লোকজন বন্ধু বান্ধব, সবই ভালবাসতাম। কিন্তু আমার এক ভালবাসা সব ভালবাসা হরণ করে নিল। সেই তো আমার সবচেয়ে ভীরু দুর্বলতা, বিহ্বলতা, স্বার্থপরতা। এই জন্যেই তো আমার চাকরির দরকার, এ জন্যেই তো আমার এত হন্যে হওয়া।

"আগে বুঝিনি, এখন বুঝি, আমার এই বিশ্বছাড়া উদগ্রতাকে প্রশ্রয় দিতে চাইনি বলেই সুপ্রীতি তার অপরিমেয় ভালবাসাকে এক নির্লিপ্ত পরিমাপের মধ্যে রেখেছিল বেঁধে। ওর ভয় ছিল, ও যদি আবেগ প্রকাশ করে, তা হলে আমি পড়ব ভেঙ্গে। প্রেম ছিল তার কাছে মহৎ, তাই আমার এবং মিঠুর কথা মনে থাকা সত্ত্বেও, কনকদির জন্য হৃৎপিণ্ডটি খুলে ক্ষত করে ফিরেছিল।

আর আমি জীবনেরই মুক্তি খুঁজেছিলাম একজনের মধ্যে। একজনই যখন এমনি করে সব হয়, তখন দশজনের প্রতি অন্যায় করতে তার আটকায় না। প্রেমে আমরা একজন উর্ধ্বগামী, একজন নিম্নগামী। বাইরে থেকে তাই আমাদের সংগ্রামকে একত্র মনে হলেও, অন্তঃস্রোতে সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি ছিল ভিন্ন। কিন্তু সেকথা, আমরা দুজনের কেউ-ই তখন টের পাইনি।

"সেই জন্যেই আমাকে নিয়ে লেখা তোমার পোষায় না। তাও সবে কলির সন্ধে। সব শোনার পর মর্মে মর্মে বুঝবে। আমি যদি এ যুগের হতাশবাহিনীর পরমপুরুষ হতাম, তা হলেও বাংলা দেশের এক শ্রেণীর ছেলের আমি প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারতাম। আমি তাও নই, এমন কি, একটা বাজে ভিলেনও নই। ভাবছ, এ কী চিঠি? আমিও তাই ভাবছি। অনেকগুলি পাতার নম্বর দিয়েছি। আর দিচ্ছিনে, কেননা তাতে লাভ নেই।"

তা তো বুঝলাম। হাতের কাজের তাড়া রইল পড়ে। নিখিলেশের চিঠির তাড়া আর একটু না পড়ে ছাড়তে পারলাম না। কী যেন ঘটেছে। কী ঘটেছে, না দেখে ছাড়ি কী করে। পড়লাম:

"আমার দিকে নজর দেওয়ার সময় কোথায় ছিল সুপ্রীতির। কিছুকাল আগেও ছিল। এখন ও আমার চেয়েও হন্যে। সেইটেই আমি বুঝলাম না। আমার গালে মুখে দাড়ি জমা হয়, আমার জামাকাপড় ছেঁড়া থাকে, সেসব দেখবার সময় নেই তার। শুধু পকেটে দুটো টাকা থাকলে বলে, আবার ধার করেছ? দিচ্ছে এখনো?

"দিচ্ছে কিন্তু অপমানও করছে। মনে আছে সুবোধকে? এখন কলেজের প্রফেসর। অনেকদিন আগে কিছু টাকা দিয়েছিল। সেদিন কফি হাউসে অনেকের সামনেই কয়েকটি বিশ্রী কথা শুনিয়ে দিলে। তারপর বললে, সুপ্রীতির কথা ছাড়া আরো কিছু ভাবিস নিখিল। নইলে সে বেচারি যে তোর আগে যাবে।

"তবু, এসব ধার কিছুই নয়। সুপ্রীতির টুইশানির পঞ্চাশই সবার বড় ভরসা। কলকাতার বালিকা বিদ্যালয়গুলি ঘেঁটে চটকে ফেলল। কোনও এক বালিকা

বিস্তালয়ের হেড্‌ মিস্ট্রেস আর কমিটি সেক্রেটারির ইন্টারভিউর গল্প শুনবে ? সুপ্রীতিকে ডেকে, ইন্টারভিউর সময় সেক্রেটারি ব... আচ্ছা, আপনি কি প্রেম করে বিয়ে করেছেন ?

সুপ্রীতির মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, কেন বলুন তো ?

সেক্রেটারি, না, মানে প্রেম করে বিয়ে করা শিক্ষয়িত্রী হলে, ছাত্রীরা সেসব বিষয় আলোচনা করে কিনা। তাতে ছাত্রীদের মর‍্যাল ডিগ্রেডেশন হয়।

সুপ্রীতি বললে, 'দেখুন, বিয়ের আগে না হোক পরেও প্রেম হয়। যে ছাত্রী আলোচনা করবে, সে তো তাই নিয়েও করতে পারে।

সেক্রেটারি, তা হলেও, সেটাতে রোমান্স কম বলে ছাত্রীদের টানে না কিনা। আশ্চর্য। হেডমিস্ট্রেস ভদ্রমহিলা ইন্টারভিউর নামে এ অবৈধ অপমান হজম করছিলেন সামনে বসে। তারপরে, বেসিক ট্রেনিং সেই বলে সেক্রেটারি সুপ্রীতিকে রেহাই দিলেন। চাকরি হ'ল না।

"এই অবস্থাই যাচ্ছে তখন। দুজনারই। আগে আমরা পথের মোড়ে তাকাতাম। এখন তাকাইনা। আগে এসে আমরা পরস্পরকে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করতাম ও বলতাম। এখন আর বলি না। আমরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেই সব বুঝতে পারতাম। তারপরে আমরা আর পরস্পরের চোখের দিকে তাকাতেও ভরসা পেতাম না।

"হঠাৎ একদিন দেখি, সুপ্রীতির পিঠে এলানো আঁচলটি ছিন্নভিন্ন। বুকটা টনটন করে উঠল। আঁচলটি ধরলাম। সুপ্রীতি চমকে, সন্ত্রস্তভাবে আমার বুকে লেপটে এল। টান পড়ে আঁচলটি আরো ছিঁড়ে যাবে, সেই ভয়ে। বুকে চেপে ধরে, আঁচলটি সামনে নিয়ে এসে বললাম, এ কী হয়েছে সুপ্রীতি ?

"বড় দুঃখেও সুপ্রীতির লজ্জা হ'ল। আঁচলটি লুকিয়ে ফেলে ফিরে তাকাল আমার দিকে। আমার চোখ ছলছল করছিল কিনা জানিনে, সুপ্রীতির চোখ সজল হয়ে এসেছিল। আমার গায়ের জামা কাপড় টেনে টেনে, বলল, আর এগুলি কী হয়েছে ? আমার আঁচলের চেয়ে বুঝি ভাল ? কেন দেখাও এমনি করে আঁচল ? সে হিসেবে তোমার দিকে যে তাকাতে পারিনে আমি।

"কী যে হ'ল, আমাদের দুজনের গলাতেই কথা আটকে গেল। বেরুচ্ছিল ও

পারল না! আমার বুকে হেলান দিয়ে রইল দাঁড়িয়ে। ও ভাবছিল আমার কথা। আমি ভাবছিলাম, কোথায় এনে ফেলেছি আমার সুপ্রীতিকে। আর মিঠুটা আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে পাক দিতে লাগল।

"খানিকক্ষণ পর ও যেন অনেকখানি সোহাগ ঢেলে বলল, এখন বেরুই, কেমন? 'না' বলার সাহস আমার কোথায় ছিল। কিন্তু ওর খোলা কাঁধে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম। বললাম, এ কি, তোমার জ্বর নাকি?

বড় অদ্ভুত হাসল ও বলল, না। রাতে ঘুম-টুম তেমন হয় না, তাই বোধহয় গা-টা একটু গস্ গস্ করে।

"চুরি করে উপোষ দিলেও যে এমনি হয়, তা জানতাম। সুপ্রীতি বেরুল। আমিও। ও চলে গেল এক পথে। আমি অন্য পথে যাব। কিন্তু যেতে পারলাম না। কেন জানিনা, পা দুটি সুপ্রীতির পেছনে পেছনে চলল ছায়ার মত। কেন? ভেবে আমিও অবাক। না না, কোন পাপ ছিল না আমার মনে। কোন সংশয় সন্দেহই ছিল না। সুপ্রীতিকে ওই অবস্থায় ছেড়ে থাকতে পারছিলাম না বলেই গেলাম। ও বলেছিল, প্রতিজ্ঞাও করেছিল কোনদিন হাঁটে না, হাঁটবে না। অন্তত ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসেও যাবে। কিন্তু যত যাই, সুপ্রীতিও ততই হাঁটে। এত বাস গেল, ট্রাম গেল। ও ফিরেও তাকাল না। তারপর হঠাৎ দাঁড়াল। কেন দাঁড়াল, কিছুই বুঝলাম না। একটু পরেই দেখি, সে দু'পয়সার বাদামভাজা কিনে হাতের ছোট ব্যাগটায় পুরে ফেলল। তারপর আবার হাঁটতে লাগল আর বাদামভাজা চিবুতে লাগল একটি একটি করে। আর আজকের দুপুরে খাওয়া ভাতগুলি আমার পেটের মধ্যে যেন চীৎকার করতে লাগল।

"ওর ছেঁড়া আঁচলটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরে ফাল্গুনের বাতাস। ওর রুক্ষচুল উড়ছে। কী অসহায় মনে হতে লাগল ওকে। বুকটা টনটন করে উঠল। ইচ্ছে হল, যাই ওর কাছে, ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলি, হাত ধর আমার। চল আমার পাশে পাশে। আমি যে আছি এখনো।"

"সেই মুহূর্তে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, আরে। গলিটা তো চেনা। হ্যাঁ এই গলিতেই সুপ্রীতির দাদার বাসা। আশ্চর্য! সুপ্রীতি দাঁড়িয়েছে একটি দরজা

বন্ধ বাড়ির সামনে। ওর দাদার বাসা। কাকে চায় ওখানে সুপ্রীতি। কেন এসেছে?

"ভাবছিলাম। কিন্তু সুপ্রীতি একটু দাঁড়িয়ে আবার চলতে লাগল। আমার বুকটা রুদ্ধ যন্ত্রণায় ফুলে উঠল। সুপ্রীতির মনে বুঝি ভাঙন ধরেছে। হয়তো নিজের জনকে আজ কাছে পেতে চায়। আমার প্রতি ভরসা করতে পারছে না আর। অথচ ভাবলাম না, অবসন্ন সুপ্রীতি আমাকে চিন্তিত না করে, মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিল একটু কথা বলতে মাত্র। একটু কথা, সান্ত্বনা একটু। দুর্ভাবনাভার মনকে একটু হালকা করার জন্য মায়ের কথা মনে হয়েছিল তার।

"তা ও যেতে পারলনা আত্মসম্মানের জন্য। চলে গেল ছাত্রীর বাড়িতে।

"দুদিন পরে বাড়ি ঢুকতে যেতেই দরজার কাছে কনকদির সঙ্গে দেখা। উনি বেরুচ্ছিলেন আমার বাসা থেকেই। দরজাতেই আমাকে বললেন, নিখিলবাবু, শুনুন।

ঃ বলুন।

ঃ সুপ্রীতির বোধ হয় মাঝে মাঝে একটু জ্বর হয়। আপনি জানেন?

"বুকটা কেঁপে উঠল। জেনেও বোধহয় জানিনি। বললাম, না তো। কনকদি বললেন, বোধ হয়। শরীরটা ভাঙছে দেখে জোর করে আমি একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছলাম। ডাক্তারের কাছে ও স্বীকার করেছে, ডানদিকের পাঁজরে ব্যথা আছে। ডাক্তার সন্দেহ করেছেন, প্লুরিসি। কিছু না হোক, এখন একটু বিশ্রামের দরকার। আর ··আর···

আমি অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করে উঠলাম, আর কী।

কনকদির চোখে জল দেখা দিল। বললেন, নিখিলবাবু আমি আর এই অশান্তিতে চাকরি করতে পারছিনে। সুপ্রীতির মত মেয়ে আজ বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছে।

"কনকদির চোখের জলে আমার মন আরো বিমুখ হয়ে উঠল। এ বিমুখতার মধ্যে একটি নিঃশব্দ জেদী কান্নার অশ্রু ছিল মিশে। সুপ্রীতির মুখটি মনে

করে আমার চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু হাত মুঠি করে আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি বললেন, সুপ্রীতির একটু খাওয়া দাওয়ার দরকার।

জানি। সেদিন বাদাম ভাজা চিবুনোর কথা আমি কেমন করে ভুলব। একদিন দেখে যে দশদিনের কথা ভাবা যায়। তবু আমার চুপ করে থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কী বুঝলেন কনকদি, কে জানে। বললেন, আমি যাচ্ছি।

চলে গেলেন।

"ঘরে ঢুকলাম। সুপ্রীতি শুয়েছিল। শুয়ে শুয়ে, মিঠুকে কোলের কাছে নিয়ে ক খ বলছিল আর মিঠু অনুকরণ করছিল। মিঠুর দু'বছর হয়ে গেছে। কতদিন পার হয়ে গেছে। আজকাল বাইরে ঘরে এলেই, এই কথাটি মনে হয়। এই ঘরের অন্ধকার ঝুল মাকড়সার জাল, নোনা দেয়াল আর ভাঙ্গাচোরা দু' একটি আসবাব, সবই যেন পুরনো জীর্ণ। যুগযুগান্তর ধরে যেন এই দেখেছি চোখে। দেখে আসছি চিরকাল।

সুপ্রীতি টের পেল, আমি এসেছি। তার আগেই মিঠু বলে উঠল, দুগি, ও এথেথে।

"দুগি অর্থাৎ দুর্গি। তোমাকে এতক্ষণে লেখা হয়নি। সুপ্রীতির ডাক নাম দুর্গা থেকে দুর্গি। ওই নামেও আমি ডাকি। মিঠু তার মায়ের ওই নামটাই জানে। আর আমাকে জানে ও। ও, ওকে, এমনি সব স্ত্রীসুলভ সম্বোধন, যা ওর মা বলে।

"সুপ্রীতি নিজের অসুখের কথা বলল না। খালি বলল, কনকদি এসেছিলেন। হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল। বললাম জানি।

আমার গলার স্বরে কী ছিল, কে জানে। সুপ্রীতি ফিরে তাকাল। আবার বলল, কনকদির সত্যি বড় অস্বস্তি। ভদ্রমহিলা—

কিছুতেই নিজেকে রোধ করতে পারলাম না। আমি নিখিলেশ গঙ্গোপাধ্যায় কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। বলে উঠলাম, ঢের শুনেছি এবং দেখছি তোমার ওইসব ভদ্রমহিলাদের কথা আর ছিরি। আমাকে ওসব বলো না।

সুপ্রীতি বিস্মিত ব্যথায় চমকে ফিরে তাকাল। বলল, কী বলছ তুমি

অক্ষম যখন বিক্ষুব্ধ হয় তখন তার বাঁধন থাকে না। বলে উঠলাম, ঠিকই বলেছি। মিথ্যে অকারণ ঝোঁকের মাথায় তোমার চাকরিটা চলে গেল। মিছিমিছি নিজের দোষে—

থমকে গেলাম সুপ্রীতির চোখের দিকে তাকিয়ে। সেই চোখ। ঢেউ নেই, টলটলে ঝিকিমিকি জলের মত। গভীর তল ও তীব্র স্রোত তাতে। সেই চোখ উদ্দীপ্ত বিস্মিত নিষ্পলক। আর ভাবো, বিস্মৃতি কী সর্বনেশে বস্তু। মানুষের কত রূপে তার কত প্রকারভেদ। কত অল্প সময়ের সমস্ত কথা আমি ভুলে গেছি। সুপ্রীতি শুধু বলল, তুমি বলেছিলে, বলেছিলে···

বলতে বলতে ওর গলার স্বর গেল তলিয়ে।

"একমুহূর্ত স্তব্ধ। লজ্জায় ও ব্যথায়, মাথা নীচু করে তাড়াতাড়ি সুপ্রীতির কাছে এলাম। কোন কথা বলতে বলতে পারলাম না। ওর হাত দুটি টেনে নিলাম। দুজনের কেউই কথা বলতে পারলাম না।

অনেকক্ষণ পর বললাম, সুপ্রীতি, যা বলেছিলাম ঠিক বলেছিলাম। কিন্তু ওই কনকদিকে আমি ওই মুহূর্তে সহ্য করতে পারছিলাম না। কেননা, তখুনি ওঁর মুখে তোমার অসুখের কথা শুনে এসেছি। তুমি সেকথা আমাকে কিছুই বললে না। প্রথমেই ওই নামটি শুনে হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল। আর সত্যি, দুগ্‌গি, তোমার অসুখ, সেই কথা শুনে আমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

সুপ্রীতি চোখ তুলে তাকাল। ভেজা চোখে তার বিষণ্ণ স্নেহ। বলল, আমার অসুখে বুদ্ধি লোপ পেলেই বুঝি কাজ হবে।

"মুহূর্তে আমার সমস্ত অস্থিরতা ক্ষোভ, অশান্তা নিভে গিয়ে এক মন্ত্রমুগ্ধ প্রসন্নতায় ভরে উঠল মন। ওকে আরো কাছে টেনে বললাম, সুপ্রীতি, কাল থেকে তোমার বেরুনো চলবে না।

সুপ্রীতি বলল, বেরুবনা। তবে ট্যুইশানিটার জন্ম একবার বিকালের দিকে বেরুব। ওইটুকুতে কোন ক্ষতি হবে না।

'না' বলার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। রাত পোহাতেই সেই অস্থিরতা আমার আবার ফিরে এল। শুধু অভাব নয়, সুপ্রীতির অসুখ। এবার তাকে হারাবার পালা আসছে হয়তো আমার।

"এক সওদাগরি অফিসে ইণ্টারভিউ দিয়ে ফিরছিলাম। ইণ্টারভিউর গল্প শুনবে? বড়বাবু অনেকক্ষণ ধরে আমাকে অনেক কথা বললেন, অনেক তথ্য নিলেন, তত্ত্ব জানালেন! তারপরে বললেন, আমাদের এ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে লোক দরকার। ক্যাশিয়ারবাবুর ভাগ্নে বি. কম. পাশ। চাকরিটা তারই হবে। আপনি এক কাজ করুন না।

কী বলুন।

বছর দুয়েক প'ড়ে, এম, কম্-টা দিয়ে আসুন না। ছোকরা বয়েস, ভাবনা কী?

"না, এবিষয়ে কোন মন্তব্য করব না তোমার কাছে। কেবলি মনে হচ্ছিল, আমার সারা মুখটা কেউ খামচে দিয়েছে। রক্ত ঝরছে সারা মুখে আর জ্বলছে দগদগে ঘা। বেরিয়ে এসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হ'ল সুপ্রীতি যাচ্ছে। কিন্তু সুপ্রাতি নয়, অন্য মেয়ে। যে কোন মেয়েকেই দেখি, সুপ্রীতি ভেবে চম্‌কে চম্‌কে উঠি। কেন জানিনে। তারপর দেখি, এরা সেই মেয়ে যাদের কাউকে আমার এক দণ্ড চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে না। আমার মনে হয়, সব মেয়ে যেন আমার চোখের সামনে এসে, তাদের দেহের ক্ষমতা, শাড়ি ব্লাউজ সব দেখিয়ে দেখিয়ে বলে যায়, আমরা তোমার সুপ্রীতির চেয়ে সবদিক দিয়ে ভাল আছি। ভাল আছি দৈনন্দিন জীবনে ও মনের সুখে। মেয়ে বিদ্বেষী হয়ে উঠছিলাম কিনা জানিনে। কিন্তু সবাইকে মনে হচ্ছিল সুপ্রীতি-বিদ্বেষিণী।

"মনে আছে প্রতিভাকে? ওর শরীরটার সঙ্গে মাথাটা ছিল একটু বড় আর বেমানান। তার ওপর ও আবার নাচতে জানত। আমরা ওকে বলতাম মধুছন্দা। কী নিদারুণ কাজল মাখত চোখে মেয়েটা। অনেকের ধারণা ছিল, প্রতিভার সঙ্গে বুঝি আমার চোখে চোখে অদৃশ্যে এক ভাবের খেলা আছে।

প্রতিভা জানত, আমি ওর নাচের একজন ভক্ত। তবে অস্বীকার করতে পারব না প্রতিভা সত্যিনৃত্য পটীয়সী ছিল।

একদিন দেখা হয়েছিল। পয়সা তো আছে ওদের। আমাকে খাওয়ালে একটা রেস্টুরেন্টে। কিন্তু কাজল মাথা চোখে এমন বারবার অপাঙ্গে দেখছিল আমাকে, যেন নীরবে হেসে বলছে, বাঃ, সুপ্রীতিকে নিয়ে তা হলে এই হাল হয়েছে তোমার নিখিলেশ! আমাকে দেখে কী মনে হয়? সুপ্রীতির চেয়ে ভাল নেই?

"মুখে বললে, সুপ্রীতি কেমন আছে?

বললাম, ভালই।

প্রতিভা একটু অবাক হয়ে বলল, শুনেছিলাম তোমাদের দুজনেরই চাকরি নেই।

"বললাম, তাতে কী? খাওয়া পরাটাই কি জীবনের সব মধুছন্দা? (মধুছন্দা! চটছে না তো! চটুক না, ভালোই তো। নইলে আমায় চটাচ্ছে কেন?) বললাম, আর একদিক থেকে সুপ্রীতি ভালো আছে, অনেকের চেয়ে সুখে আছে।

বুঝলাম প্রতিভা আর একটু অবাক হ'ল আমার মুখের দিকে চেয়ে। তখন বুঝিনি, প্রতিভার সহৃদয় সাধারণ কথাগুলি আমি অকারণ একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম।

মনে হ'ল, প্রতিভার সুনিপুণ কাজল লেখা যেন লেবড়ে ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। বলল, সে কথা বলিনি নিখিলেশ। তোমাকে তো জানি। হাজার বিপদেও সুপ্রীতির মনের একটি দিক চিরদিনই ভরে থাকবে। তবু অভাব বড় হীন জিনিস।

কিন্তু জান তো, বাংলায় একটি কথা আছে, তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবী ভোলবার নয়? আমার তখন সেই অবস্থা! প্রতিভা ব্যথিত হবেই তো। এমনিতেই প্রতিভাদের বাইরেটা আমি দেখেছি চিরকাল। ভিতরটা কোনদিন দেখিনি, দেখবার ইচ্ছেও হয়নি। এই সমাজের মানের মানদণ্ডে ওদের পাল্লা ভারী। বাইরে থেকে যতই মনে হোক, পারিবারিক জীবনে ওদের কী

ভয়াবহ নীচতা, কুশ্রীতা। মনের ব্যাপারে ওদের কাঙালপনাও অসীম। জীবনে সংশয় সন্দেহ প্রতি পদে পদে। আগুন আছে ওদের বুকে, যে আগুনে পুড়ে মরে শুধু নিজেরা। আর কাউকে সে আগুন স্পর্শও করে না।

শাড়ী কাজল ভ্যানিটি ব্যাগ দিয়ে মেয়েদের বাইরের চেহারার বিচারের দিন চলে গেছে! চলতি অর্থে আমরা যে ধরনের বিচার করি, সেই বিচারের কথাই বলছি। ওই বস্তুগুলি ঘরে বাইরে, সব নারীদেরই আছে। কিন্তু প্রতিভাদের বাইরে একটা মিথ্যে সুখ ও শান্তির আনন্দোজ্জল মুখোস আছে আঁটা। যত দুঃখ, সেটাকে ওরা ততই শাণিত করে। কিন্তু ওদের একজন একজন ক'রে, মানুষ হিসেবে বেছে বিচার করলে, ওদের বেদনার সাগর অকূল হ'য়ে উঠবে।

প্রতিভা যে আমাকে বলেছিল, 'তোমাকে তো জানি!' সেটুকু মিথ্যে নয়! ও জানত। জানত যে আমি সুপ্রীতিকে ভালবাসি সত্যি! ও জানত, অভাব বড় হীন জিনিস। বোধহয় আমার চেয়ে ভাল ক'রে জানত। যে হাত খরচ করে, সেই হাত-ই অভাবকে ভয় করে সবচেয়ে বেশী। হীন হতে হয় বলেই হীনতাটা ওদের চোখের সামনে দেখা দেয় বেশী।

প্রতিভা আমার কাছে সহজ হয়েছিল, আমি হতে পারিনি। আসল পাপ যে ছিল আমার মধ্যে। মিথ্যে বলে লাভ কী! যত বিদ্বেষ থাক, আমি যে-চেয়েছিলাম, এদের মতই হবে সুপ্রীতি। আমার সমস্ত নীতিবাগীশতার আড়ালে মনে প্রাণে প্রতিভাদের ওই মিথ্যে মুখোসের উপাসক ছিলাম। সেইজন্তেই, প্রতিভার শেষ কথাতেও আমি যন্ত্রণাই ভোগ করেছি। তখনো মনে হয়েছিল, ভালমানুষী মুখে ও গলায় অভাবের কথা বলে ও শুধু আমাকে শাসিয়েই গিয়েছিল।

ও চলে যাওয়ার পরমুহূর্তেই মনে হল, সামনে আমার দাঁড়িয়ে রয়েছে সুপ্রীতি। ওর তীব্র লাল ঠোঁটে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ। ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখে বিদ্রূপ হেনে যেন বলছে, বাইরে মেয়েদের কাছে এত জাঁক কিসের তোমার! আমি সুখে আছি, এ তো মিথ্যে কথা। একেবারে মিথ্যে।

"হ্যাঁ, যা বলেছিলাম সেইদিন ফিরছিলাম ইণ্টারভিউ দিয়ে। আমার শরীরটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। টন টন করছিল চোখ দুটি। সেই বড়বাবুর বিষয়ে কোন মন্তব্য করব না। কিন্তু, মনে হচ্ছিল কে যেন আমার গলা টিপে ধরছে। শিথিল হয়ে আসছে আমার হাত পা। ব্যাপারটি আমার ক্রোধকে যতখানি উজ্জীবিত করেছিল, ততখানি ভয়ে আমি দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিলাম বিশ্বসংসারের এ তল্লাটে আমার আনাগোনা ছিল না। তাই মনে হচ্ছিল, এক বিচিত্র প্রভাতে স্বপ্ন ভেঙ্গে আমি যেন দেখছি, আমার আনন্দের সব সমারোহ দাঁড়িয়ে আছে ঘাতকের মূর্তি নিয়ে। সংশয়ের পাপ আমাকে গ্রাস করছিল। তাই রাগে ও ভয়ে আমি ভয়ংকর হয়ে উঠেছিলাম। মনে হচ্ছিল, বাঁচবার জন্য আমি এখন কারুর গলাও টিপে ধরতে পারি। ঠিক সেই সময়ে আমি সেই ডাক শুনতে পেলাম।

"ঠিক সেই সময়ে, যে সময়ে আমার মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অফিস পাড়াটা তার বিরাট শির বিদ্রূপ করছিল সমস্ত কিছুকে। যখন ব্যাংকের কাউণ্টার থেকে পানের দোকান পর্যন্ত এক অদৃশ্য ভয় ও বিক্ষোভ মাথা কুটছিল, ঠিক সেই সময়ে আমার প্রাণেরই মর্মস্থল থেকে যেন সেই ডাক শুনতে পেলাম। সেই ডাক আমার জীবনের শেষ আহ্বান।

"পাশ থেকে কে ডেকে উঠল, নিখিলেশ না ?

"ফিরে তাকিয়ে হঠাৎ চিনতে পারলাম না। কেমন একটু বিদ্রূপ মেশানো হাসি লোকটির ঠোঁটের কোণে। ঢিলে পাঞ্জাবীর বোতামগুলি খোলা, যদিও জামাকাপড় ধোপদুরস্থ। তাম্বুল রঞ্জিত ঠোঁট। চোখের ঈষৎ ঢুলুনির মধ্যে কেমন যেন বেহেড ভাব। জুলফি আর কপালের কাছে চুলে কিছু পাক ধরেছে।

"সে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, কী হে ব্রাদার, চিনতে পারলে না ?

"সেই মুহূর্তেই চিনতে পারলাম। বললাম, তুমি হরিদাস।

"হরিদাস বললে, গুড্! এদিকে এসেছিলে কি ঘোড়দৌড়ে নাকি ?

"ডালহৌসিতে ঘোড়দৌড়! অবাক হয়ে বললাম, না তো। একটা ইণ্টারভিউ—

"হরিদাস হেসে উঠল। আর এমন দরাজ গলায় হেসে উঠল রাস্তার মাঝখানেই যে, কয়েকজন পথচারী তাকিয়ে দেখল আমাদের! বলল, ওর নামই তো ঘোড়দৌড়। আর তোকে দেখে মনে হচ্ছে, টিপস্ ফস্‌কে গেছে। আরে ডালহৌসি স্কোয়ারের চেয়ে বড় জুয়ার আড্ডা আর কোথাও নেই। এখানেই তো সবাই আগে আসে ভাগ্য পরীক্ষা করতে।

"বলে আবার হাসল। আর হরিদাসের বিষয় আমার মনে পড়তে লাগল সব। তোমার মনে আছে তো হরিদাসকে! আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি হরিদাস তখন ফিফথ্ ইয়ারে। সেখানেও অনেক ঠেকতে ঠেকতে উঠেছিল সে। তারপর আমরা যখন ফিফথ্ ইয়ারে এলাম, হরিদাস বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লে। আসলে ইউনিভার্সিটি ছিল ওর আড্ডার জায়গা। বাইরে মফঃস্বল শহরের এক কোর্টে ওর বাবা ছিলেন খুব পশারওয়ালা উকীল। ছেলেকে এম. এ. পাশ করতেই হবে, এই ছিল বাপের গোঁ। আর হরিদাস বলত, কী বিপদ বল দিকিনি। যা পারব না, তাই নিয়ে কারবার করেই দেখছি আমার জীবন কেটে যাবে।

"হরিদাসের বাবার মত বিচিত্র বাঙালীর তো অভাব নেই এ দেশে। বছরের হিসাব করলেন না। এন্তার টাকা পাঠাতেই লাগলেন। ছেলেকে এম. এ. পাশ করতেই হবে। হরিদাসও যদৃচ্ছা খরচ করেই যেতে লাগল।

"ইতিমধ্যে বীণাদির মত মেয়ে হরিদাসের প্রেমে পড়েছিলেন। ভাবো, প্রেমের কী চিচিত্র গতি। নইলে, বীণাদির মত মেয়ে হরিদাসের প্রেমে পড়ে। আর যে হরিদাস সেই প্রেমকে চলত পায়ে মাড়িয়ে। তবু বীণাদি ঘুরতেন হরিদাসের পায়ে পায়ে। বীণাদি এক সময়ে কয়েকটি গল্পও লিখেছিলেন, মনে আছে তো! আর ভাবো বীণাদিদের বাড়ির কথা। কত বড় কাল্‌চার্ড পরিবারের মেয়ে। রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, সবকিছুতেই ও বাড়ির মতামত নিয়ে গোটা কলকাতার ছাত্র সমাজের মাথা টন্‌টন্ করত। অবশ্য কালচারের সঙ্গে যৌবনের একটি চিরকালীন মুগ্ধতাবোধের চাবিকাটি ছিল ও বাড়িতে। সেটি হল রূপ। বীণা, রীণা, লীলা, এই তিন বোনের রূপের আকর্ষণটাও কম ছিল না কিছু।

সেই বাড়ির বড় মেয়ে বীণাদি। যার পায়ে পায়ে ঘুরছে অনেকে। আর বীণাদি ঘুরছেন হরিদাসের পায়ে পায়ে। হায় প্রেম! জানিনে এমন অসম্ভব ঘটনা কেমন ক'রে, কার কারসাজিতে সংঘটিত হয় সংসারে।

"আজকে হরিদাসের যে মূর্তি দেখছি, কেমন যেন বেহেড নির্লজ্জ, সেই তখনই হরিদাসের মধ্যে এ ছায়াটা ফুটে উঠেছিল। আমরা শুনতাম, হরিদাস নাকি কখনো কখনো মদ্যপানও করে। আমরা আড়ালে গালাগাল দিতাম হরিদাসকে, সামনে এলে কথা না বলে পারতাম না। ওর কথা বলার গুণ ছিল।

'তারপর ওদের বিয়ে হয়েছিল, বীণাদিকে নিয়ে হরিদাস তাদের বাড়িতেও গছল। শুনেছিলাম, সে তার বাপকেও ফতুর করেছে। কয়েকটি ছেলেমেয়ে য়েছে বীণাদি'র। কিন্তু হরিদাস সেদিকে মাড়ায় কম। সংসার পালনের দায়িত্ব বীণাদি'র ঘাড়েই পড়েছিল! তারপরেও হরিদাস সম্পর্কে নানান কথা শুনেছি।

"মাস কয়েক আগে একদিন বীণাদি'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনই জানতে পারলাম অনেক কথা। কী বিশ্রী হয়েছে বীণাদি'র চেহারা। চিনতে পারা যায় না। অনেক কথা হ'ল পথে পথে। কিন্তু বীণাদি নিজের কথা প্রথমে কিছুই বলছিলেন না। যেচে নিজের দুঃখের কথা বলবার মত মেয়ে ছিলেন না বীণাদি। আমি বললাম, হরিদাস এখন কী করছে বীণাদি?

"বীণাদি একটু হেসে বললেন, বুঝলাম নিখিলেশ, তুমি এখনো মদ খাও না, জুয়া খেল না।

"কেন বলুন তো!

"শুনেছি কলকাতার এমন কোন মাতাল কিংবা জুয়াড়ি নেই, যে ওকে (হরিদাসকে) চেনে না।

"বড় অদ্ভুতভাবেই বীণাদি হরিদাসের অবস্থার কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। দেখলাম, বীণাদির কোল-বসা চোখ দুটি অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিন্তু কাঁদলেন না। তবু দুচোখ ভরা জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালাম। মুখে বলতে পারলাম না, বীণাদি এমন মানুষকে কেন আপনি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু

বীণাদি খানিকটা আত্মগতভাবে বলে উঠলেন, অনেক কিছু আশা করেছিলাম, হল না। শুনেছি জুয়া খেলারও আজকাল রকমফের হয়েছে। এখন জীবন নিয়ে জুয়া খেলে। তবু বলব নিখিলেশ, লোকটার কোন কিছুর উপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা গেল না, কিন্তু ওর যা সাহস ছিল, তাতে অনেক কিছু হতে পারত। বুঝলাম, বীণাদি আজো হরিদাসকে ভালবাসেন। হায়রে ভালবাসা।

"সেই হরিদাস। আর ভাবো, আমার জীবনের কী এক বিচিত্র সন্ধিক্ষণে হরিদাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। চরিত্রকে অবসাদের চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই। আর আমি সেই মুহূর্তে সেই অবসাদের চরম পর্যায়ে পৌঁছেছি। আমার ছোট মন, ছোট ক্ষমতা সব কিছু নিয়ে অবসাদ ও হতাশার অন্ধকারে, আর কারুর গলা টিপতেও রাজি আছি, সেই অন্ধকারের মধ্যে হরিদাসের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। হরিদাস যেন এক মুহূর্তেই সব বুঝতে পারল, আর সেই মুহূর্ত থেকেই হরিদাসের হাতে চলে গেল যেন আমার জীবনের চাবিকাটি।

"এর পরে তুমি যতই জানবে, ততই হয় তো সাহিত্যিকের মতই ভাববে, আগের সব কথাগুলি বুঝি আমি শুধু মাত্র এই হরিদাসের আবির্ভাবের জন্যেই গেয়েছি আর সাজিয়েছি। কিন্তু সেগুলি সবই ঘটনা, আমার হাত নেই তাতে। প্রকৃতপক্ষে এতক্ষণ আলাপই হয়েছে। এইবারই বোধহয় আসল গানের শুরু।

"হরিদাস আবার বলল, নিশ্চয়ই ইণ্টারাভিউ দিতে এসেছিলি, সেটা ফসকে গেছে, না?

"হরিদাসের উপর মন বিরূপ ছিল। তবু বললাম, হ্যাঁ। কী করে বুঝলে।

"হরিদাস হেসে বলল, তোর মুখ দিয়েই তো বুঝিয়ে দিচ্ছিস। বলে একমুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, বেশ আছিস তোরা। এখানে সেখানে কপাল ঠুকিস, এখনো সেই ছাত্রদের মত কচি মুখখানি নিয়ে ঘুরে মরিস, আর বউয়ের কাছে গিয়ে—

হেসে ফেলল হরিদাস।

"বললাম, বউয়ের কাছে গিয়ে—?

"নিশ্চয় কাঁদুনি গাস, আর কী করতে পারিস? বলে আমার দিকে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল হরিদাস। হরিদাসের সামনে কেমন যেন দুর্বল বোধ করছিলাম নিজেকে।

"তবু গম্ভীর হয়ে বললাম, তোমার কাছে সেটা কাঁদুনি হতে পারে হরিদাস। আমরা সেটা স্বামী-স্ত্রীর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেই জানি।

"হরিদাস গলায় অদ্ভুত বিদ্রূপ ঢেলে বললে, আরে, জানবি বৈ কি। জীবনে এখন ওইটুকুই তো আছে। ওইটুকুও যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন বউ ভাববে তুই বদমাইস হয়ে গেছিস। কিন্তু সেই পবিত্র প্রয়োজনীয় কথা বলেও কি কিছু আসল কাজ হচ্ছে? বলে সে ঘাড় কাৎ করে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকাল।

"হরিদাসের কথার মধ্যে যতই বিদ্রূপ রূঢ়তা থাক, কোথায় যেন একটি যুক্তি ছিল। আসলে সেই হতাশবাহিনীর পরমপুরুষের বুকে তার আধ্যাত্মের দেবতা একটু একটু ক'রে ভয় করছিল। আমিও রূঢ় হয়ে বললাম, কোন কাজ না হোক, তোমার বক্তব্য কী হরিদাস? তোমার মত জুয়াড়ী হতে হবে?

"আমার মত? হরিদাস হাসল। বলল, কথাটা যত সহজ, কাজটা তত সহজ নয় ব্রাদার। আমার মত জুয়াড়ী হতে, তোকে বহুদিন রগড়ঘষ করতে হবে। জুয়াতে আমি যত জিতি তত হারি। সেজন্য জীবনটা এখনো সস্তা জুয়ার ডাইসে পেতে বসিনি। মিথ্যে বল না হরিদাস। তুমি যদি তোমার জীবন-ডাইসে ফেলে না থাকো, তবে আর কে ফেলেছে?

"তোরা, ওরে তোরা। হরিদাস জুয়া খেলে, খেলা নিয়ে পাগল। ডাইসে ফেলি আমি খেলার তাস আর পাশা। তোরা তো জীবনটাই যুধিষ্ঠিরের পাশায় রেখেছিস। বাঁচবি কি মরবি, সেই ভয়ে ফিরছিস্ হন্যে হ'য়ে। আমার বাঁচা মরার সমস্যা নেই।

"হরিদাস যে কতবড় অমানুষ, তার এই কথাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি জিভে বিষ ঢেলে বললাম, যে মরেছে, তার তো বাঁচা মরার সমস্যা থাকে না হরিদাস। কিন্তু বীণাদি'র সমস্যা—

পাঃ

"হরিদাস একটি অদ্ভুত শব্দ করে হেসে ফেলল। কী এক বিশ্রী তীব্রতা ছিল এ হাসির মধ্যে। আমি নীরব হয়ে গেলাম। ও বলল, জানতুম শেষ পর্যন্ত এ কথায় না এলে, তোদের আদর্শ বজায় থাকে না। কিন্তু ও সমস্যাটা আমার নয়, তোদের বীণাদির। জীবনে যে দুঃখকে যেচে নিতে চেয়েছে তাকে সুখের দিকে দেখিয়ে লাভ নেই। তোদের মত সচ্চরিত্র আদর্শবাজ বলে তো বীণার কাছে কোনদিন ভাণ করিনি, তার পায়ে পায়েও ঘুরিনি। তোদের বীণাদি 'পাষাণে পীরিত কইরে হইয়াছে পাগল।' তার ওষুধ তো আমার কাছে নেই।

"হরিদাস যত নিষ্ঠুর এবং নীচই হোক, তুমিও জানতে, হরিদাসের কথাগুলির মধ্যে একটি সত্যি ছিল। আমরাও কম বিস্মিত হইনি যখন দেখেছিলাম বীণাদি'র মত মেয়ে হরিদাসের পিছনে পিছনে ফিরছেন। এ রীতি বড় বিপরীত। হরিদাস তখনো ভাল ছিল না। তখন বুঝিনি, এই মুহূর্তেও পরিষ্কার বুঝিনে, তবু মনে হয়, বাপের জেদ আর ঘরোয়া জীবনের বাইরে, হরিদাসও বিপরীতধর্মী হয়ে উঠেছিল বোধহয়। হরিদাস বোধহয় ভেবেছিল, এ সংসারটার রূপ হ'ল, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী ওর বাপ মা আত্মীয়-স্বজন ওর জীবনের গোড়া থেকেই, যে মাটিতে ওর রস নেই, সেই মাটিতে চারা পুঁতেছিল। সারাটি জীবন ওকে রং রসহীন, এক মিথ্যে প্রেরণার পিছনে ছুটতে হয়েছে পরের কথায়। জানিনে, হয়তো হরিদাস অল্প বিদ্যেয় একজন মোক্তার হতে পারত কিংবা মফঃস্বলে খুলে বসতে পারত কোন ব্যবসা! নয়তো আর কিছু। সেইজন্যেই ধর্মের কাহিনী শুনতে ওর ঘৃণা ধরেছিল।

"আমার দিকে ফিরে আবার বলল, আমি খারাপ হয়ে গেছি, সে তো শুনেছিস্! তোরা খারাপ হলিনে, ভাল হয়েই বা ঘরের সমস্যার কী সমাধান করলি? ভাল ছেলে খেতে পাসনে, বউ ছেলেকে পুষতে পারিসনে, সেজন্যে বুঝি তোদের পেছনে আমাদের হাততালি দিতে হবে? বলে হরিদাস আবার হেসে উঠল। তোরা ভালোর কলটি করেছিস্ ভালো। অনেকের

বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে তো নিয়ে গেলি সুপ্রীতিকে! তাকে নামালি কতখানি?

"আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল। মিথ্যে হলেও হরিদাসের কথার মধ্যে কিছু সত্য ছিল। মরুভূমির বুকে আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেতে অসহায় ভীত উটের মত আমার বুকের মধ্যে আঁ আঁ শব্দ উঠল। কাগজের মত শাদা হয়ে উঠল আমার মুখ। তবু, কারুর বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে তো আমি সুপ্রীতিকে বিয়ে করিনি। বললাম, কী বলছ তুমি হরিদাস। সুপ্রীতিকে তো আমি কেড়ে নিইনি কারুর কাছ থেকে।

"কী কুক্ষণেই না দেখা হয়েছিল হরিদাসের সঙ্গে। বলল, সেই ভেবে তুই আনন্দে আছিস, সুপ্রীতিও কি আছে?

"এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম, মানে?

"মানে আর কী! নীতিশ ব্যানার্জীর মত ছেলে আজ গাড়ি চড়ে বেড়ায়। নীতিশও একদিন চেয়েছিল, সুপ্রীতিকে। মেয়েরা কোনদিনই মাটিতে পা দিয়ে চলে না। ইমর্‌যাল বলে সুপ্রীতি তখন নীতিশকে আমল দেয় নি। বলে হরিদাস আমার দিকে ভ্রূ তুলে চোখ কুঁচকে তাকাল। তার ঠোঁটের কোণে কী ভয়াবহ হাসি। আবার বলল, তুই কি ভাবিস, নীতিশের কথা আজ একবারও মনে হয় না সুপ্রীতির? একবারও কি ভাবে না, তোর মহান প্রেমের মরণ থেকে নীতিশের ঐশ্বর্যে কত সহজে সে গা ঢেলে দিতে পারত!

"প্রতিটি কথা আমার মুখে চাবুক কষতে লাগল। আমার বুক কেঁপে উঠল ভয়ে। জানি, তখন আমার উচিত ছিল, আমাকে, বিশেষ করে সুপ্রীতিকে, এভাবে অপমান করার জন্য হরিদাসকে আঘাত করা। কিন্তু আমার দুর্বল হৃদয় আগেই জর্জরিত হয়েছে হরিদাসের মারে। এমন কি, আমি তখন বীণাদি'র উদাহরণটুকুও তুলে ধরতে পারলাম না হরিদাসের সামনে। যে বীণাদি তার মত লোককে বিয়ে করেও জীবনে কোন পাপ করেননি কোনদিন, মনেও আনেননি কোন পাপচিন্তা। তবুও আমি চাপা গলায় বলে উঠলাম, ছিঃ হরিদাস, একথা আজ তুমি কেমন করে বলছ?

"হরিদাস হেসে বললে, জানি, সত্যভাবণে স্বয়ং রাজাও ক্ষিপ্ত হন। তুই তো নিখিলেশ গাঙ্গুলী। কিন্তু অস্বীকার করতে পারিস, যে-স্বপ্ন দেখিয়েছিলি সুপ্রীতিকে, তার এক কড়াও পূর্ণ করতে পারলিনে!

"যদিও তখন আমার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়েছে হরিদাস, সংশয়ের বাষ্পে তুলেছে ভরপুর করে, তবু আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললাম, আমি কোন স্বপ্নই তাকে দেখাইনি হরিদাস। তোমার সব কথা মিথ্যে।

"বলে মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই হরিদাস আমার হাত টেনে ধরল। এই হাত টেনে ধরা আমার জীবনের শেষ সর্বনাশের হাত টেনে ধরা, তখন বুঝিনি। বলল, রাগ করছিস? ওরে রাগের জন্য বলিনি। আমার কথা কেউ ধরে না। চল, নিবারণের দোকানের কাছে যখন এসে পড়েছি, একটু চা খেয়ে নিই।

"বললাম, না হরিদাস, না।

"হরিদাস বলল, এই মরেছে, তুই যে সত্যি রাগ করলি দেখছি। তোদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। এমন শুকনো মুখ দেখে তোকে ছাড়ি কেমন করে। আয়, একটু কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। পয়সা তো এখন লাগবে না।

"তাকিয়ে দেখলাম, বহুবাজার স্ট্রীট। একটি গলির মধ্যে ঢুকে, এক স্বল্প পরিসর আধো অন্ধকার চায়ের দোকানে ঢুকলাম হরিদাসের সঙ্গে চায়ের দোকানের ভেতরে আর একটি ঘর, নিশ্চয়ই বাস করবার ঘর। গোলগাল একটি গ্রাম্য ধরনের লোক বসেছিল উনুনের ধারে। মনে হ'ল, লোকটি ঘুগনি তৈরি করছে। একটি বেঞ্চি, গোটা দুয়েক ভাঙা চেয়ার। দেখলেই বোঝা যায়, ছারপোকা মৌরসীপাট্টা গেড়েছে। লোকটি বলল, এই যে হরিদাসবাবু কোথায় ডুব দিয়েছিলে এ্যাদ্দিন।

"হরিদাস বলল, কাজের ফিকিরে ছিলাম। তুমি আমাদের একটু কিছু খাওয়াও তো নিবারণদা।

"নিবারণ আমাকে বারকয়েক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। চোখে তার অদ্ভুত চাপা অনুসন্ধিৎসা। মনে হ'ল, গাঁয়ের চাষী মানুষ যেমন শহরের মানুষকে

আগা-পাশতলা দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তেমনি ! একটু সন্দেহ, একটু শ্রদ্ধা, কিছু বিস্ময়, খানিকটা অবিশ্বাস। বলল, বস।

"আমরা বসলাম। কিন্তু আমার চোখের সামনে বারবার সুপ্রীতির মুখটি ভেসে উঠতে লাগল। না, সে নীতিশের জন্য কতখানি ব্যাকুল হয়েছিল, সেকথা আমার মনে এল না। সমগ্রভাবেই আমার চোখের সামনে কেবলি সুপ্রীতির দুটি অশ্রুসজল চোখ ভাসতে লাগল। সেই বাধাবন্ধনহীন বৈরাগিনী, আজ ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে চোখের জল মুছছে। কী করুণ আর মর্মান্তিক সে দৃশ্য। আমাকে ভালবেসেই সে যে তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে, আগে এমন করে আর আমার মনে হয়নি। মনে হ'ল, ওকে আমি কতদিন যেন বুকে টেনে নিইনি। কতদিন দুটি ভাল কথা বলিনি। তিন বছর হয়ে গেছে, বিয়ে হয়েছে আমাদের। সন্তান হয়েছে একটি। তবু যেন আমার প্রাণে এক নতুন প্রেমের জোয়ায় এল; সুপ্রীতির সঙ্গে নতুন করে প্রেম করবার পালা এল যেন। হরিদাসের কাছ থেকে ছাড়া পেলেই আমি ছুটে যাব তার কাছে।

"কেন জানিনে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল নিবারণ আর হরিদাস যেন চোখাচোখি করছে আর নিঃশব্দে তাদের মধ্যে কিসের এক ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছে। তাকিয়ে দেখলাম হরিদাসের ঠোঁটের কোণে হাসি। বললাম, হাসছে যে ?

"হরিদাস: হাসছি। ভাবছি, তা হলে তোর চাকরির জন্য ঘোরা, পাগল হওয়া, এসবই সার করেছিস জীবনে। যা সব ভাল ছেলেরাই করে। তারপর, তারপর কোনও এক ফাইন মর্নি-এ হয় চাকরি, নয়তো সংবাদপত্রের দুর্ঘটনার কলমে বেকার যুবকের আত্মহত্যা কিংবা মৃত্যু, না ?

"আবার সেইসব কথা, যে কথার মধ্যে পা পিছলে পড়ার অন্ধকার মহাশূন্য গহ্বরের টান। বললাম, ওসব কথা থাক হরিদাস।

"হরিদাস: আমি রেখে দিলেও যে ওসব কথা থাকবে না ভাই নিখিলেশ। জীবনটা তোর খাসী। তোকে তুই আগায় পাছায়, যেখানে খুশি কাটতে পারিস। কিন্তু সত্যি কথা হাজারবার বলব। ভালর দিন আর নেই। মন্দর রাজ্যে মন্দ না হলে, পেট চলে না, পীরিতও থাকে না।

"ঝিমিয়ে হেসে বললাম, সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় হরিদাস। তা হলে দুনিয়াটা মন্দ হয়ে যেত।
"অবাক হয়ে ভাবি আজ, তখনো এইসব সত্যিকথাগুলি কেমন করে বলেছিলাম। হরিদাস বললে, দুনিয়াটা যদি ভাল, তবে, তোদের মত ভালর কেন এমন দুর্গতি? ওসব আদর্শের কথা রাখ নিখিলেশ, বেঁচে থাকতে হলে আজ মন্দেরও দরকার।
"আমার হাসিটি আরও ঝিমিয়ে গেল। বললাম, পকেট কাটতে বলছ হরিদাস?
"পকেট কাটতে হাত সাফাইয়ের দরকার নিখিলেশ।
"তবে? চুরি করব?
"তেমন সিঁদকাটি কোথায় পাবি তুই?
"তা হলে ডাকাতি করতে হয়।
"না, তার জন্য ক্ষমতা দরকার।
"তবে?
"হরিদাস হেসে উঠল। বলল, তবে? তবে কি আমিই জানি। লোকে যারে মন্দ বলে, মন্দ সে-ই নয়। তারো অনেক পরিশ্রম, বুদ্ধি খাটাতে হয়। সে তো মন্দ নয়, বাঁচবার জন্য তাকে একটা রাস্তা খুঁজে বার করতে হয়।
"এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, হরিদাস রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছে। সে যেন কী ভাবছে। তার চোখে মুখে সেই ছায়া। সে একবার নিবারণের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ বলল, তোকে আমি একটা কাজ দিতে পারি, কিন্তু তুই তো নিবিনে।
"কেন?
"শুনলেই হয় তো তোর খারাপ লাগবে। আদর্শবাদী ভাল ছেলে তোরা।
"তবু শুনি।
"হরিদাস একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, না, থাক নিখিলেশ।
"তবু, শোনবার জন্য ছটফট করতে লাগল আমার মন। হরিদাস হঠাৎ উঠে বলল, তুই চা খা, আমি নিবারণদার সঙ্গে ভেতরের ঘরে একটা কথা বলে

আসছি। আমার মুখে সন্দেহের ছায়া দেখে হরিদাস নীচু গলায় আবার বলে উঠল, ভয় নেই। নেহাৎই টাকার কথা বলব। আমারো তো খাওয়া পরার টাকা দরকার। ওর কাছে চাইব। একটু আড়াল না হলে চাইতে পারব না। বোস্, খা। এস নিবারণদা।

"সে আর নিবারণ পাশের ঘরে চলে গেল। আমার যেন মনে হ'ল, আমি কোথায় ডুবে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। আমার বড় খারাপ লাগছিল। তবু আমি কাণখাড়া করে চায়ে চুমুক দিলাম। কিন্তু শুনতে পেলাম না কিছুই। শুনতে পেলাম না ব'লে আমার কোন আক্ষেপ ছিল না। কিছু কৌতূহল ছিল। হরিদাস বললে, টাকা চাইব। কিন্তু ধার বলেনি।

"খারাপ লাগছিল, এই পরিবেশের জন্য, ওই স্থূল সন্দিগ্ধ চোখ নিবারণের জন্য। হরিদাসের কথাগুলি মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছিল, সেজন্য।

"শুনতে পাইনি, কিন্তু আজ তোমাকে যখন লিখছি, তখন তো আর আমার কিছু জানতে বাকি নেই। আজ যে আমি সবই জানি, সেদিন বন্ধ দরজার মধ্যে নিবারণের সঙ্গে কী কথা বলছিলি হরিদাস? আমি তো তোমাকে গল্প লিখতে বসিনি। তোমার কাছে কেন সেই সাস্‌পেন্স রাখতে যাই। হরিদাস আর নিবারণের হুবহু কথাগুলি তোমাকে লিখে দিচ্ছি।

"আমাকে বসিয়ে রেখে হরিদাস নিবারণকে ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

"নিবারণ তখনো কিছুই জানে না। বলল, কী ব্যাপার গো হরিদাস মুকুজ্জে? ছোকরাটি কে?

"হরিদাস বলল, সে পরে হবে নিবারণদা। তোমাদের দেশ সেই মীরগাঁ থেকে একবার একটি লোক এসেছিল মনে আছে?

"নিবারণ: মীরগাঁয়ের লোক? সে তো কতই এসেছে। গাঁয়ের মানুষ সব।

"হরিদাস: তোমার গাঁয়ের মানুষেরা সব জাহান্নামে যাক্। একজন, সেই কোন্ বাঁড়ুয্যের গোমস্তা একবার এসেছিল। বলেছিল, বাঁড়ুয্যের মেয়ের বিয়ে—

"নিবারণের কপালে ভাঁজ পড়ল কয়েকটি। বলল, ও, তুমি সেই মাধব বাঁড়ুয্যে মশায়ের গোমস্তা নন্দ কায়েতের কথা বলছ?

"হরিদাসের চোখে আলো ফুটে উঠল। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মীরগাঁয়ের মাধব বাঁড়ুয্যে। খুব বড়লোক বলছিলে না?
"হ্যাঁ।
"কয়েক লাখ টাকা ক্যাশ, আর অস্থাবর সম্পত্তি আর কয়েক লাখ টাকা, না?
"হ্যাঁ।
"সন্তানের মধ্যে একমাত্র মেয়ে, না?
"হ্যাঁ। কিন্তু—
"মেয়েটি কানা, এই তো? তারা খুঁজছিল এম, এ, পাশ সচ্চরিত্র একটি ছেলে, যে বিয়ে করে সমস্ত সম্পত্তি পাবে এবং ঘরজামাই হয়ে সব রক্ষে করবে, নয়?
"হ্যাঁ। অবশ্য—
"হরিদাস বলল: মেয়ের মা নেই বাপও বুড়ো হয়েছে, তাই ছেলের তুল্য একটি জামাইয়ের হাতে সব কিছু দিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে থাকতে চায়।
"নিবারণ বলল, হ্যাঁ, তা-ই। তোমার তো সব মনে আছে দেখছি।
"হরিদাস: তা আছে। সেই বিয়ে হয়ে গেছে?
"নিবারণ: তা তো ঠিক বলতে পারছিনে। অনেক দিনের কথা তো!
"হরিদাস চিন্তিত হল একটু। বলল, হুঁ, হাওড়া থেকে কতদূর?
"তা পেরায় মাইল পঞ্চাশেক।
"হরিদাস: খবরটা নিতে হবে নিবারণদা, খুব তাড়াতাড়ি।
"নিবারণ: কিসের?
"হরিদাস: বিয়েটা হ'য়ে গেছে কিনা।
"নিবারণের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের আভাস। বলল, কেন তুমিই—
"হরিদাস হেসে বলল, না, আমার ভাইপোর জন্যে।
বলে আর কোন কথা বলার অবসর না দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে।
"আমি তখন সেই জনহীন হতভাগা চায়ের দোকানটায় বসে আবার সুপ্রীতির ভাবনায় গেছি ফিরে। দেখলাম হরিদাসের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এতক্ষণ যেন তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। নিবারণ লোকটির প্রতি বিরূপ হ'য়ে

উঠল মন। এতোক্ষণে না জানি কত কষ্ট দিয়েছি হরিদাসকে। হঠাৎ হরিদাসের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতি আমার একটু মায়া হ'ল। মনে হ'ল, হয়তো তার এই অসামাজিক জীবনযাত্রার মধ্যে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়।

"হরিদাস অদ্ভুত হেসে বলল, সংসারটা বড় কঠিন।

"মনে হল, সামজিকভাবে হরিদাসও ব্যর্থ হয়েছে টাকার জন্যে। তাতে যেন করুণার মধ্যেও একটু খুশি হলাম আমি। চা খেয়ে ওঠবার মুখে, আবার জিজ্ঞেস করলাম, কই, কী কাজের কথা বলছিলে হরিদাস, বললে, না তো?

"হরিদাসের যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনিভাবে বলল, ও হ্যাঁ, সেই কথা। বলব, শুনতে যদি চাস নিতান্ত বলবই। তবে আজ নয়। কোথায় তোর দেখা পেতে পারি বল তো।

"অস্বীকার করব না, মনে মনে বড় হতাশ হলাম। মনের মধ্যে আসলে আশা নিয়ে ছিলাম ব'সে। যত খারাপই হোক হরিদাস আর তার এই পরিবেশ, আমি যদি একটি কাজ পেয়ে যাই সেই তো আমার স্বার্থ। তখন একটি মুহূর্তও লাগবে না হরিদাসকে ভুলে যেতে। এই তো আমাদের মানস প্রকৃতি। সব খারাপ স্থানে, সব মানুষের কাছেই পারি যেতে, যদি বাগিয়ে নিতে পারি কিছু।

"বললাম, তার তো কোন ঠিক নেই হরিদাস।

"আচ্ছা, সাতদিন বাদে, এসময়ে তোকে কোথায় পাবো?

"এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে।

"ও! সেখানেও আটকা পড়েছিস্। ভাল, সেখানেই দেখা হবে। ব'লে একমুহূর্ত চুপ ক'রে কী ভাবল হরিদাস। তারপর আচমকা দৈববাণীর মত বলল, সুপ্রীতির প্রতি যদি তোর ভালবাসা একবিন্দুও থাকে, তবে আমার কথা হয়তো রাখবি। আরো অবাক ও উৎসুক হয়ে তার দিকে ফিরতেই হরিদাস তাড়াতাড়ি বিদায় নিল! বলল, আজ আর নয়, আগামী শুক্রবার।

বলে কয়েকটি টাকা আমার পকেটে ফেলে দিয়ে সে হন্ হন্ করে চলে গেল।

"টাকা! কিন্তু কী বলে গেল হরিদাস! যদি ভালবাসি সুপ্রীতিকে! যদি ভালবাসি! আজ তাতেও লোকে আমাকে সন্দেহ করে! হরিদাসের কথার ভাবে মনে হ'ল, শুধু লোকে নয়, বুঝি সুপ্রীতিও সন্দেহ করে।

"বেলা যায়। কলেজ স্ট্রীট দিয়ে না গিয়ে, সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু দিয়ে হেঁটে চললাম। কলেজ স্ট্রীটে বড় চেনা মানুষের ভিড়। চেনা মানুষের হাসি আর দেখতে পারিনে। হতাশার সেই শিখরেই তখন আমার বাস।

"সব কিছুতেই আমার মন ও চোখের সেই ভাব। বেলা শেষের এই ফাল্গুনের বাতাসে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুটা কেমন এলোমেলো হয়ে উঠছে। সংশয় ও ভয়ের আগুনে মন পুড়তে লাগল। হরিদাস কোন আশা দেয়নি। শুধু ভয়ের দেওয়াল খাড়া ক'রে দিয়েছে চারদিকে। সেই দেয়ালে রক্ত আর রোগ বীজাণু কিলবিল করছে। আমার বুকের মধ্যে হু হু করছে, কিন্তু সেই হু হু করার মধ্যে আমি যেন এ বাতাসে শুধু রোগ বহনের সর্বনাশা পাগলামিই দেখছিলাম। আকাশে যে গাঢ় লালিমা লেগেছে, যার প্রতিচ্ছায়া পিছলে পড়েছে এ্যাভিন্যুর ওপরে বড় বাড়িগুলির গা বেয়ে, সে লালিমা যেন, আমার দুপাশের মেডিকেল ও ইসলামিয়া হাসপাতালের উড়ে আসা বিষাক্ত রক্তের ব্যাণ্ডেজের লালিমা। শূন্যপত্র গাছগুলির রিক্ততা আমার দুচোখে শুধু ঘৃণা জাগিয়ে তুলছে।

"কিন্তু কী বিচিত্র কথা বলে গেল হরিদাস। যদি একবিন্দু ভালবাসাও থাকে সুপ্রীতির প্রতি! কী কথা! কেন বলল এ কথা!

"বাড়ি এলাম। নিঃশব্দ বাড়ি। দরজাটি খোলা। জানালার কাছে একটি মূর্ত। সুপ্রীতি। কোথা থেকে সামান্য আলোর আভাস এসেছে ঘরে। সেই আলোয় দেখলাম, মিঠু ঘুমোচ্ছে মেঝেয়।

"এসেছিলাম এক মন নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে। কত কথা বলব মনে করেছিলাম। কিন্তু নীরবে গিয়ে শুধু দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম সুপ্রীতিকে। সুপ্রীতি চমকে একবার আমার দিকে তাকিয়ে, আমার বুকের কাছে আরো ঘন হয়ে যেন লেপটে গেল। যেন সে লেপটে একেবারে মিশে হারিয়ে যেতে চায়। লুকিয়ে পড়তে চায় একেবারে।

"আজ আরো অসহায় মনে হ'ল সুপ্রীতিকে। আর আমার বুকের মধ্যে বাড়তে লাগল নিঃশব্দ কান্না। ঘরের মধ্যে বাতাসটা এখন কান্নার স্বরে হাহাকার করছে।

"দুঃখেরও একটি সীমা আছে। তাকে নিয়ে অহঙ্কারেরও সীমা আছে। তাকে কেন্দ্র করে শুধু কথা, কথা আর কথা, তারও শেষ আছে। সেই সীমায় এসে পৌঁছেছে সুপ্রীতি। আমি সেই সীমায় পৌঁছুবার আগেই গেছি ছড় খেয়ে। তাই কথা বলবার প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু কথা বলতে লজ্জা হ'ল আমার।

"আমরা দুজনে দেহলগ্ন হয়ে যেন দুর্ভাগ্যের দরজায় অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় মনে পড়ল আবার হরিদাসের কথা। পকেটে কয়েকটি টাকার কথা। আর—যদি ভালবাসি। যদি···!

"ডাকলাম, দুর্গি!

"সুপ্রীতি ফিরে দাঁড়াল আমার দিকে। তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের হলকা লাগল আমার গায়ে। চমকে বললাম, জ্বর নাকি তোমার?

"ও বলল, না।

"আমার আর ওর, দুটি কথাই কেমন অর্থহীন মনে হ'ল। আর এই মুহূর্তে মনে পড়ল হরিদাসের সেই কথা। সেই—সুপ্রীতি যদি নীতিশের হাতে পড়ত। নীতিশের ঐশ্চর্যের মুক্ত আলো আর নিখিলেশের এই মৃত্যুগুহা।

"পাপ থাকে আমাদের মনের আশে পাশে। গন্ধ পেলেই সে নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে কামড়ে ধরে হৃৎপিণ্ড। হঠাৎ মনে হ'ল, হয়তো এই নিরালা অন্ধকার ঘরে সুপ্রীতি এ জীবনকে ধিক্কার দিচ্ছিল। ভাবছিল আর কিছু, আর কাউকে। বললাম, তুমি যে কখনোই কিছু বল না সুপ্রীতি।

"সুপ্রীতি বলল, কিসের?

"আমি: আমার এই দীনতা, অক্ষমতার কথা তো কিছুই বল না।

"অন্ধকারেও বুঝলাম, সে একটু হাসল। বলল, কী যে বল! দীনতা শুধু তোমারই, আমার নয়?

"বলতে বলতে তার হাত আমার বুক পেরিয়ে উঠে এল গলায়। তারপরে বুঝলাম, কান্নায় তার কথা আটকে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমারও গলার কাছে যেন একটি শক্ত বস্তু আটকে গেল।

"সুপ্রীতির এ কান্না আমারই অসহায় অবস্থার জন্ত। আমার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকার তখনো সম্পূর্ণ ঘটেনি। আমি আমার প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে তার এই নীরব মমতা আদর এবং স্নেহ অনুভব করছিলাম। সুপ্রীতি বুঝতে পারছিল, আমি হতাশার পঙ্কে পা দিয়েছি। তাই সে যেন আমাকে তুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

"মুহূর্তের পাপচিন্তা আমাকেই ধিক্কার দিতে লাগল বারংবার ?

"আজ, এই মুহূর্তে আমার এক নতুন চৈতন্যোদয় হ'ল। ফুটপাতের বাসিন্দা নরনারীদের অনেক সময় প্রেম করতে দেখেছি। এ দেশের বারো ঘণ্টা করে খেটে আধপেটা-খাওয়া মেয়ে পুরুষের প্রেম করা দেখছি আমারই আশেপাশে। এতদিন এ প্রেম দেখে ঘৃণায় উঠেছি শিউরে। ভেবেছি পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ওটা নগ্ন প্রকাশমাত্র।

'কিন্তু অভাবের মধ্যে আরো কিছু ভাব আছে। আমার সেই ভাবের দরজা খুলে দিল সুপ্রীতি। আকাশ বাতাসের রং ও সুর বদলে গেল আমার কাছে। যে আকাশ বাতাস আমার কাছে কিছুক্ষণ আগেও বীভৎস মনে হয়েছিল।

"রিক্ত ভোলানাথের শ্মশানসঙ্গিনী ভাত কাপড়ের অভাবেও মহাপ্রকৃতির বেশে লীলা করেছে। ভয়ডরহীন সেই লীলাকে আমরা অতিপ্রাকৃত মনে করেছি। বুঝতেও পারিনি, সুপ্রীতির মত আবেগ চাপা মেয়ে, মেয়ে নয়, বউয়ের রক্তে রক্তেও সেই লীলার স্রোত নিয়তই তরঙ্গায়িত।

"আমি আমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট দিয়ে তার ব্যথা সমুদ্রের প্রতিটি তপ্ত লবণাক্ত অশ্রুবিন্দু পান করতে লাগলাম। বাতাসের মধ্যে অনেকদিনের পুরনো সেই সুর বাজতে লাগল। গান গাইতে গিয়ে গানের ভাষা হারিয়ে যাওয়া, বুকের সুধায় ভরে ওঠা, অমৃত কুম্ভের কণ্ঠ আপ্লুত সেই সুর।

"হরিদাসের ঘিরে দেওয়া সেই রক্ত দেয়ালটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তুচ্ছ হ'য়ে গেল হরিদাস, হারিয়ে গেল আমার মনের সব সংশয় আর ক্লেদ নিয়ে।

"জীবনের সব হতাশাকে সেই মুহূর্তে, আমাদের হৃদয়ের রসে ভাসিয়ে দিয়ে, একই গানের সুরে একাত্ম হয়ে গেলাম দুজনে সুপ্রীতি আমার মাথা তার বুকে টেনে নিয়ে বলল, তুমি ভাবছ, আমি তোমাকে কিছুই বলিনে। আমি

ভাবি, তুমিও যে আমাকে কিছুই বল না। আসলে বলার তো কিছুই নেই। আমরা দুজনে যে দাঁড়িয়ে আছি একই জায়গায়।

"তারপর আমাকে খেতে দিল সুপ্রীতি। জানতাম, এতে অনেকখানি ওর কনকদির অবদানও আছে। কেরোসিন কাঠের এবড়োখেবড়ো বুক শেলফটার কাব্য সাহিত্য ও সমালোচনার বই যোগান দিয়েছে কিছু। যে কোন পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রের বাড়িতে বইগুলি পাওয়া যাবে।

"আমাদের এ রাত্রিটা যেন একটি অধ্যায়ের শেষ রজনী গেল। পরদিন চাঁপা এসে হেসে হেসে বলল সুপ্রীতিকে, দিদি, এবার আমাকে চলে যেতে হবে।

"সুপ্রীতি বলল, কেন ?

"আমরা ভেবেছিলাম সে টাকার কথা বলবে। কিন্তু সে নিঃশব্দে শুধু হাসতেই লাগল আর মিঠুকে চাপতে লাগল তার বুকের কাছে। আমরা একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। তারপরে আরো অবাক করে দিয়ে সে কেঁদে ফেলল। *পাকা গিন্নীটির মত বললে, এই ছেলে ছেড়ে আমি এখন কি করে* পরের ঘর করতে যাই বল তো ?

"ও ! চাঁপার বিয়ের ঠিক হয়েছে বুঝি !

মিঠু বললে তার আধো আধো গলায়, তাঁপা তোকে দেতে দেব না।

"বিকেলে এল চাঁপার মা। কাছাকাছি পাড়াতেই বাড়ি। বললে, বর্ধমানে বিয়ের ঠিক হয়েছে। বিঘে ত্রিশেক জমি আছে ছেলের বাপের। বছুরকে ধানটা আসে ঘরে। চাষবাসের ঘরে যাবে চাঁপা। মোটা ভাত কাপড়ে পেটে পিঠে থাকবে ভালই।

"কিন্তু আমাদের সামনেই তাদের মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল। চাঁপা তো ফুঁসে উঠল তার মাকে, খুব তো বলছিস ! ছেলেটাকে দেখবে কে ? বলে মিঠুকে দেখালে।

"চাঁপার মা হেসে কেঁদে আকুল ! শোন মেয়ের কথা ! তা বলে কি বিয়ে হবে না। মেয়েমানুষ বলে কথা। একটা সঙ্গী ছাড়া সে থাকে কেমন করে ?

না, কি গো। যখন আসবি, তথন দেখবি। তারপর, নিজে যখন বিয়োবি, হাড়কালি করবি, তথন দেখব, কত সোহাগ থাকে ছেলের জন্মে।

"তবু রক্ষে ফাল্গুনের শেষে চাঁপার বিয়ে। এখন ফাল্গুনের সবে শুরু।

"চাঁপার কাছে আমাদের পয়সার চিন্তা করতে হয়নি। তারপর?

"কয়েকদিন পর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে সেদিন মনটা বড় তিক্ত হয়ে উঠল। কোনক্রমেই সেই তিক্ততা চাপতে না পেরে, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটিকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আশা আছে কি না। কর্মচারী ভদ্রলোক একটুও বিরক্ত না হয়ে ফাঁসির হুকুমের মত নির্বিকার গলায় বললেন, আপনার আগে আপনার মত বাংলার এম. এ. লাইন দিয়েছে চুরানব্বুই জন। অর্থাৎ আমার ব্যস্ত হওয়ার তথনো কিছুই হয়নি নাকি। সবাই যদি ডাকে সাড়া দেয়, তবে নাইনটিফিফথ্ হ'ল আমার ক্রমিক সংখ্যা।

"আমি অনুভব করছিলাম, আমার আশেপাশের সবাই যেন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে! শুধু তাকিয়ে নেই, যেন বেঁকে আছে তাদের নজর! কিন্তু আসলে তারা সহৃদয়ভাবেই তাকিয়ে ছিল। কেননা, আমার মত তাদেরও প্রাণ পুড়ছিল। কিন্তু পোড়ানির সঙ্গে, আমার মনটাই ছিল বেঁকে। আমার কাণ মুখ, যেন দাউ দাউ করে পুড়ছিল। তবু নড়তে পারছিলাম না। শিরদাঁড়া থেকে কিসের একটা কাঁপুনি শির শির করে বেয়ে উঠে আসছে আমার মস্তিষ্কে। তার আর একটি শাখা নিম্নগামী হয়ে হিলহিল করে নেমে যাচ্ছে আমার পায়ের দিকে। এমন একটি তীব্র ভয়াবহ অনুভূতি আমি আর কথনো অনুভব করিনি। মনে হচ্ছিল, আমার দেহে ভার নেই, আর কোন সাড়া নেই ওই অনুভূতিটুকু ছাড়া। পড়ে যাব হয় তো এখুনি। এটা শুধুই মাত্র দৈহিক অবসাদ নয়, এরমধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী বোবা বিক্ষোভও ছিল।

"এমন সময় আমার ঘাড়ে একটি হাত পড়ল। বলল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, চলে আয়। ডাইসে পঁচানব্বুইয়ে কোন পয়েণ্ট নেই। দশে তার নম্বর শেষ। বাদবাকী রাজ-রাণী-নোকর। পঁচানব্বুই বছরের কিছু জুটবে না।

"দেখলাম হরিদাস। টেনে নিয়ে এল আমাকে নিবারণের দোকানে। দুপুরের এই নিরালায়, দোকানে আজ আরেকটি মানুষ ছিল। নিবারণ

উনুনে হাওয়া দিচ্ছে, আর একটি প্রৌঢ়া বসে বসে ঘুগনি জ্বাল দিচ্ছে। প্রৌঢ়াটির কাঁচাপাকা চুলের সিঁথেয় সিঁদুর, নাকে নাকছাবি। পরে শুনেছিলাম, প্রৌঢ়াটি নিবারণের প্রেমিকা। মীরগাঁ গ্রামের গোয়ালার ছেলে নিবারণ। কলকাতায় আসত আগে ছানা নিয়ে। কালক্রমে এই মেয়েমানুষটির সঙ্গে ভাবের বশে গাঁয়ের বাড়ির ছেলে বউয়ের সঙ্গে অ-ভাব ঘটেছে। নিবারণ এখন হয়েছে কলকাতা বাসী। সেইজন্যেই এই দোকান্। যদিও, এখনো তার মীরগাঁয়ে যাতায়াত আছে।

"হরিদাসের সঙ্গে সেখানে ঢুকতেই নিবারণ অভ্যর্থনা করল। হরিদাস করল চায়ের হুকুম। হুকুম করে হরিদাস বলল, ভাল মানুষ মরলে লোকে করুণা করে, মন্দ মানুষ মরলে বলে, বাঁচলুম। আসলে দুটোই আপদ, বুঝলি নিখিলেশ। মরার চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই।

"মরণের কথা কেন। কেমন যেন ভয় করতে লাগল আমার। বললাম, এসব কথা কেন হরিদাস।

হরিদাস : তোকে দেখে আমার ভয় করছিল নিখিল।

বলে, আমার চিবুকে হাত দিয়ে আমার মুখটি তুলে ধরল সে। তার চোখের তল দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওপরে ভাসছিল মুগ্ধতা। বলল, এত অভাবেও তোর মুখখানি বেশ কাঁচা রয়েছে। আসলে ওটা তোর ভালোমানুষীর ছাপ! তোর ওই মুখে মরণের ছাপ দেখলে বড় ভয় করে। তোর দিকে তাকিয়ে আমার সুপ্রীতির কথা মনে পড়ছিল।

"আমার চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। কিন্তু তারচেয়ে বেশী ফুটে উঠল ভয়। ভয় মৃত্যুর। আমার মুখে মৃত্যুর ছাপ দেখতে পেয়েছে হরিদাস। হরিদাস বলল, খ্যাখ, আমি আর তুই এক নয়। তুই না থাকলে সুপ্রীতির অবস্থাটা—

"আমি বলে উঠলাম, থাক হরিদাস।

"হরিদাস আমাকে চিনে নিয়েছিল। তাই জোর করেই বলতে লাগল, সে শিক্ষিতা আর অশিক্ষিতা, যা-ই হোক, তবু মেয়েমানুষ।

"আমি বললাম, হরিদাস, তুমি একটা কাজের কথা বলবে বলেছিলে?

"হরিদাস বলল, বলব, এখুনি বলব।

বলে, সে নিবারণকে বলল, নিবারণদা, তোমরা একটু ওধরে যাও। আমার বন্ধুর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

নিবারণ আমাদের সামনে চা দিয়ে, তার প্রৌঢ়া প্রেমিকাকে নিয়ে চলে গেল। হরিদাস কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মুখ খুলল। তার বুকে জমানো গুপ্ত সর্বনাশী কালো বিষ ধোঁয়ার মত তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আমাকে ছেয়ে ফেলতে লাগল।

"তুমি বুঝতে পারছ, কী কথা সে বলছে আমাকে। মীরগাঁয়ের মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই অন্ধ মেয়েটির কথা, যার আর কোন দোষ নেই। আর আছে অগাধ অর্থ, যা আমি হাত বাড়ালেই পেতে পারি। শুধু দুটি মন্ত্র পড়ে বিয়ের একটু অভিনয় করা।

"প্রথমে আমি ভয় পাইনি, রাগ পর্যন্ত করতে পারিনি। শুধু বিস্মিত হয়ে শুনছিলাম হরিদাসের কথা; এ পাপ নয়, একটা ট্যাকটিস মাত্র। হরিদাসের কথাগুলি আমার দেহের কোন্‌খানে কেটে কেটে বসছিল জানিনে। তারপর, এক সময়ে আমাকে উঠে দাঁড়াতে হ'ল। তখন আমার হাত পা কাঁপছে। দু'বছর আগে হলে, এ প্রস্তাবের বাস্তবতাটুকুও আমি স্বীকার করতে পারতাম না। হেসে উঠতাম নিশ্চয়ই। অপমানে, রাগে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াতে গিয়ে, চায়ের কাপ ডিস্‌ নীচে পড়ে গেল। বললাম, এই কি তোমার সেই চাকরি হরিদাস?

"হরিদাস তেমনি গলায় বলল, চাকরি বলতে পারিস্‌, নয় তো যৌতুক। কিন্তু, পকেটমার, চুরি, ডাকাতি, কোনটাই নয়।

"আমার গলায় এত তীব্রতা ছিল জানতাম না। বললাম, তার চেয়েও জঘন্য। এ জাল জুয়াচুরি, রাহাজানি।

"হরিদাসের অসীম সাহস। বললে, জাল জুয়াচুরি রাহাজানি কিনা জানিনে, বাঁচবার একটা উপায় তো বটে।

"আমার হাত নিস্‌পিস্‌ করছিল। চীৎকার করতে পারছিলাম না এ পাড়াটার মধ্যে। বললাম, থাক! ধন্য তোমার সাহস হরিদাস। দরিদ্র হতে পারি, তবু জেনে রেখো, মরণ এর চেয়ে অনেক সুখের।

"এসব বলেও আমার প্রাণ শান্তি পাচ্ছিল না। হরিদাস যত নির্বিকারভাবে এ প্রস্তাব করেছিল, তত নির্বিকারভাবে আমি এটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। সেই-তো আমার দুর্বলতা। এই যুগে, আমার কোন বিবাহিত বন্ধু এ প্রস্তাব শুনলে, হরিদাসের মুখের উপর হেসে উঠতে পারত। কেননা, তার কাছে এ বিষয়টি শুধু হরিদাসেরই হীন সমস্যা বলে মনে হ'ত। কিন্তু আমি মনে করলাম, আমার অসহায়তাকে কেন্দ্র করে এইটি হরিদাসের এক হীন ষড়যন্ত্র। সেই জন্যেই আমি হাসতে পারলাম না।

"আমি চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই, হরিদাস আমার হাত চেপে ধরল। বলল, শোন্ শোন্। যা বলছি, ওগুলো আমারই সব মুখস্থ আছে, দরকার হ'লে আমিও বলতে পারি। আর সাহস আমার হয়তো একটু বেশি। নিখিলেশ, তোর এই দারুণ দুরবস্থায়, তোর জন্যে কিছু করবার সাহস আমার আছে।

"এখন লিখতে কুণ্ঠিত হচ্ছিনে। আমার চোখ জ্বলছিল ধ্বক্‌ধ্বক্ করে। বললাম, থাক, যথেষ্ট হয়েছে।

"হরিদাস হাসল তার সেই তীব্র নির্লজ্জ বাঁকা হাসি। বলল, না যথেষ্ট হয়নি, তার এখনো বাকী আছে নিখিলেশ। অনেক কিছু বাকী আছে…

"অনেক কিছু বাকী আছে। কথাটা যেন কোন ভয়াবহ দৈববাণীর মত কাণে বাজল আমার। গুর্‌গুর্ করে উঠল আমার বুকের মধ্যে। আর সেই গুরু-গুরুধ্বনি বুঝি পৌঁছুল হরিদাসের কাণে। হরিদাস বলতে লাগল, এর চেয়ে জোরালো প্রতিবাদ তোর আর কী থাকতে পারে? মহামানবের একটি কথা আমার মনে পড়ছে, 'ভাবো শেষের সেদিন কী ভয়ঙ্কর!' শেষদিন সাধনেই। তখন তুই সেকেলে নাটকের নায়কের মত বলবি, এই দেশটা আমাদের বাঁচতে দিল না। তাই না?

"বলতে বলতে হেসে উঠল হরিদাস। কী তীব্র ধার সেই হাসি! আর আমি চেপে রাখতে পারলাম না নিজেকে। চীৎকার করে বললাম, চুপ কর হরিদাস। এই চীৎকারের মধ্য দিয়ে আমার তেজের চেয়েও, দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়ে গেল অনেক বেশি।

"হরিদাস বলল, কেন চুপ করব। আমি জুয়াড়ি মন্দ লোক বলে বড় খারাপ লাগছে হয়তো নিখিলেশ। একথাই যদি তোদের সমাজের কোন প্রতিষ্ঠাবান লোক বলতেন, কিংবা তোর সত্যিকারের খুড়োই বলতেন, তা হলেও মনে করতিসনে। তবু বলছি তো, সব দায়িত্ব আমার, তুই তো ছবির মত কাজ করে আসবি। কারুর কোন ক্ষতি হবে না। অথচ—

"ক্ষতি হবে না? পরের জীবনে এতবড় সর্বনাশ করে—

"কার সর্বনাশ। মাধব বাঁড়ুজ্জে তো গতায়ু। সেই অন্ধ মেয়েটি? চির অন্ধকারে যার বাস। দশটি স্ত্রীওয়ালা স্বামী হলেও কী আসে যায় তার জীবনে। পরিবর্তে তুই যা পাবি সেটা, কী? তুড়ি মেরে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের বিল্ডিংটাই তুই উড়িয়ে দিতে পারবি।

"যেন আমি তখনো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, হরিদাস আমার কাছে সত্যি সত্যি ওইরকম একটি প্রস্তাব করেছে। আমি আবার তার মুখের দিকে তাকালাম। বিস্ময় ক্রোধ ঘৃণা, বোধ হয় ভয়ও ছিল আমার চোখে। এমন কি, অনুনয়ও ছিল। বললাম, হরিদাস, তুমি কতবড় শয়তান আর অমানুষ, আমি জানিনে। নইলে, তুমি কী করে ভুলে গেলে, আমার সুপ্রীতি আছে, মিঠু আছে।

"হরিদাস অদ্ভুত চাপা অথচ হাল্কা গলায় হেসে বলল, আছে নাকি? মনে আছে দেখছি অথচ আমি ওদের কথা ভেবেই বলেছিলুম।

"ওদের কথা?

"নয়? তুই বলিস্ তো, এ প্রস্তাব আমি নিজে গিয়ে সুপ্রীতির কাছে করতে পারি। সে নিজে অনুমতি দেবে।

"সুপ্রীতি?

"হ্যাঁ, সুপ্রীতি, তোর বউ। তিলে তিলে যে মরছে আর অভিশাপ দিচ্ছে নিজের জীবনকে, ভালবাসাকে। ওর অপরাধ, ভালমানুষ নিখিলেশ গাঙ্গুলিকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছিল।

"আচমকা এক নিদারুণ ভয় আমাকে তাড়া করে নিয়ে গেল দোকানের বাইরে। আমি কথা বলতে পারছিনে। সুপ্রীতির নাম নিয়ে একটি ভয়ানক

জায়গায় আঘাত করেছে হরিদাস। যে জায়গায় আঘাত আমি সহজে সামলাতে পারব না।

"হরিদাস নেমে এল আমার সঙ্গে। বললে, শোন।

"বললাম, না।

"হরিদাস তবু পায়ে পায়ে এল। ওর সেই নির্লজ্জ বেহেডপনার মধ্যে হঠাৎ আক্রোশ ফুটে উঠল। বললে, তুই ভাল থেকে, সৎ হয়ে মরবি, ও বেচারীদের কী দোষ বলতে পারিস্? জানি, সুপ্রীতি ভাল মেয়ে। তুই মরার আগে সে কিছুই করবে না। তারপরে, হয়তো আবার কাউকে বিয়ে করে শান্তি পাবে—

"কী কথা বলছে হরিদাস। কী ভয়ানক কথা। মৃত্যুর ছাপ আমার মুখে দেখতে পেয়েছে বলেই আজ এমনি ক'রে একেবারে শেষ ক'রে দেওয়ার ছুরি শানিয়েছে সে। মহাঘাতক ছদ্মবেশ ধরে আজ আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। যেন জুয়ায় হেরে যাওয়া মানুষটার চোখের সামনে, একটি একটি করে রংএর তাস তুলে তুলে দেখাচ্ছে হরিদাস। সে ঠিক চিনেছিল আমার আজন্ম ভীরু পচা মনটাকে। এখনো আমার পলাতক পদক্ষেপ বুঝতে ওর ভুল হচ্ছে না। হরিদাস আবার বলল, প্রাণের চেয়ে মূল্যবান বস্তু কিছু নেই। সততার নামে তুই জোচ্চুরি করছিস্ সেই প্রাণের ওপর।

"বলতে বলতে আবার সে আমার হাত ধরতে আসছিল। ততক্ষণে গলিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়েছি। হরিদাস ডাকল, শোন—

"না।

"হরিদাস থেমে গেল। আমি দিকবিদিক না দেখে হাঁটতে লাগলাম।

"কেন আমি এত কথা তোমাকে লিখছি। বোধহয়, অনেকদিন বাদে, আজ সেই সব স্মৃতির মধ্যে ডুব দিতেই, সেই সয়তান আবার আমার ঘাড়ে চেপেছে। পাপকে সহজ করার ছল খুঁজছি, বোধহয় তাই। তবু ঘটনাগুলি লিখছি অবিকৃতভাবেই।

"ফাল্গুনের মাঝখানেই, বাতাসে যেন চৈত্রের উষ্ণতা ও মত্ততা লেগেছে। ডাস্টবিনের রাবিশগুলি রোদে শুকিয়ে এখন পাগলের মত বাতাসের তাড়ায়

ছুটেছে। চলন্ত ট্রামে আর বাসে ধাক্কা খেয়ে কলকাতার পথে পথে বাতাস পাক খাচ্ছে। প্রাসাদে পাঁচীলে ছুটোছুটি করা কলকাতার বসন্ত বাতাস যেন সার্কাসের টাট্টু ঘোড়া হয়ে গেছে। বিকালের ভিড় লেগেছে রাস্তায়।

"মেয়েদের শাড়ি আর ব্লাউজের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে, হাসিতে চাউনিতে, আমি যেন শুধু অবৈধ প্রেম কাড়াকাড়ি, লালসার উল্লাস দেখতে পাচ্ছিলাম। আর পুরুষগুলি সব ওৎ পেতে আছে বৈধ জীবনের খিড়কীর দোর বেরিয়ে এসে! তাদের চোখ থেকে গড়াচ্ছে লালা। কী ভয়াবহ আর বীভৎস এই সংসারের রূপ। কোথায় যাই। আমার সর্বাঙ্গ পুড়ছে। বুঝতে পারছি, পুড়ছে রক্তের মধ্যে। মণিবন্ধের শিরায়, কিংবা গলার টুঁটির কাছে পিন দিয়ে ফুটো করে দিতে পারলে হয় তো একটু আরাম পেতাম।

"একটু আরাম। মনে হ'ত, হঠাৎ যেন পৃথিবীর মরার ঘরে সুইচ টিপে, যে যেখানে ছিল, সবাইকে সেই অবস্থায় মেরে রেখে দিয়েছে। শুধু ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, বাতাস বইছে, তবু গাছগুলি নড়ছে না। কিন্তু একটু পরেই, একজোড়া ছেঁড়া জুতো পায় দিয়ে, থস্ থস্ করতে করতে হরিদাস আসছে আমাকে খুঁজতে, দাঁড়িয়ে থাকা, বসে থাকা, হাসতে থাকা, কাঁপতে থাকা শবের মধ্যে। শুধু একটি শব্দ সারা পৃথিবীতে, হরিদাসের ছেঁড়া জুতোর থস্থসানি।

"থস্ থস্ শব্দ শুনে চমকে তাকালাম। আমাদের পাড়ার গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। কে যেন যাচ্ছে আমার আগে আগে, থস্ থস্ করতে করতে। দেখলাম, সে আমাদের বাসাতেই ঢুকল, আমারই ঘরে। সে সুপ্রীতি।

"আমি হরিদাসের কাজ থেকে পালিয়ে এলাম সুপ্রীতির কাছে। কেননা, তখন শুধু সুপ্রীতিকে একটু দেখবার জন্যেই সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তার কাছে এলে আমার সব অপবিত্রতা, আমার সব দুর্বলতার রুদ্ধশ্বাস কুয়াশা পেরিয়ে সবকিছুকে দেখতে পাই স্বচ্ছ আনন্দময় দৃষ্টিতে।

"আমরা দুজনে বাড়ি আসতে চাঁপা চলে গেল। আমরা দুজনের যে কেউ আগে বাড়ি ফিরতাম, তার দিকেই চাঁপা জিজ্ঞাসা ব্যাকুল চোখে চেয়ে থাকত। সেই চোখে একটি মাত্র জিজ্ঞাসা, চাকরি হয়েছে?

"তার কাছ থেকে ওইটি পেয়েছিল মিঠু। সেও জজ্ঞেস করত, তিত্তি হয়েথে?
"ঘরে ঢুকতেই সুপ্রীতি ফিরে তাকিয়ে বলল, তুমি এসে পড়েছ?
"অবাক হ'য়ে ফিরে তাকালাম। কি ছিল সুপ্রীতির গলায় জানিনে। মনে হ'ল, এ ঘরের অনেকদিনের মৃত্যু-স্তব্ধতার প্রতীক দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক ঝিল্লিস্বরের মধ্যে এক নতুন সুর উঠল বেজে। ব্যাকুল হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম সুপ্রীতি কে। সুপ্রীতি আমার বুকে হাত দিয়ে গতিরোধ ক'রে বলল, দাঁড়াও মশাই। আজ সুখবর শোনাব একটি তোমাকে।
"সুখবর! বুকের সমস্ত তন্ত্রীগুলি নিঃশব্দে চীৎকার ক'রে উঠল, কী? কী? কী?
"আমারই বুকের জামা খুটতে খুটতে বলল সুপ্রীতি, কনকদি তোমার জন্য একটি পঞ্চাশ টাকার ট্যুইশানি জোগাড় করেছেন। কাল থেকে পড়াতে যাবে সকাল বেলায়।
"এই সুখবর! ভেবেছিলাম, যে বাণ মেরেছে হরিদাস, সুপ্রীতির খবরে সেই বিষবাণের কাটান হয়ে যাবে। কিন্তু তা তো হল না। সে বিষ যে আরো জোরালো হ'য়ে বেজেছে আমার দুর্বল বুকে।
"কিন্তু সুপ্রীতি আশাবাদিনী। এই সামান্য খবরের মধ্যে সে গাঢ় অন্ধকারের বুকে পেয়েছে আলোর ইশারা। জীবনকে সে লোভের চোখে দেখেনি, লাভের মন দিয়ে কষেনি। সংসারকে সে দেখছে বড় অনাড়ম্বর বেশে। সেখানে সুখ এবং দুঃখ সবই আছে, তার মহাসমারোহের আড়ম্বর নেই। মানুষ বড় কষ্ট ক'রে বেঁচে থাকার সব সুখ দুঃখটুকু আহরণ করে। তাই, এ শুধু খবর নয়, সুখবর।
"আমি খুশি হইনি। কিন্তু কোন খুশির ভানও করিনি। সুপ্রীতিকে বুকের কাছে টেনে, আমি, আমার চাপা কান্নার নোনা স্বাদটাকে চেপে দিতে চাইছিলাম স্বস্তির হাসি দিয়ে। সুপ্রীতির দেহলগ্ন হ'য়ে আসলে আমি হরিদাসের করাল ছায়াটাকে চাইছিলাম দূর ক'রে দিতে। আসলে আমার প্রতিটি ভীত ব্যগ্র চুম্বনের মধ্যে আমি নিষ্পাপ সাহসের আশ্রয় চাইছিলাম।

"সুপ্রীতি ভেবেছিল, আমি সুখবরের উল্লাসে মেতেছি।

"পরদিন গেলাম পড়াতে।

"আজ ভাবি, এ কী অবস্থার কথা যে এমন একটি শিক্ষিত দম্পতিও শুধুমাত্র অর্থাভাবে এতবড় একটা ভাঙ্গনের মুখে এসে পড়েছিল।

"সত্যি! যারা গল্পে উপন্যাসে নিজের জীবন বাদ দিয়ে শুধু প'ড়োর মন নিয়ে কন্‌ভিন্‌স্ হ'তে চেয়েছে, তাদের বোঝাবার মত কথা আমার কিছু নেই। একমাত্র জীবনের ও মনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই এর বিচার সম্ভব। সেইজন্যে, নিজের মনের সেই অদ্ভুত পাপ-সাধনার কথা তোমাকে বলে নিই। সুপ্রীতির মত জীবনকে কোনদিনই তো অনাড়ম্বর বেশে আমি দেখিনি। দেখেছি মহাসমারোহের বেশে। সে সমারোহ দুঃখের ও ভয়ের।

"যা অনাড়ম্বর, তা-ই অসীম দিগন্তহীন। আড়ম্বরের সজ্জা আছে। তাকে দৈর্ঘে প্রস্থে বেঁধে সাজাতে হয়।

"আমি সেই সাজানো জীবনের ছোট্ট পরিধি চেয়েছিলাম। সার্কাসের ঘেরাওয়ের ঠুলি আঁটা টাট্টু ঘোড়াটার মত।

"কেমনতরো? না, কালচারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখব আমার ঘর। আমাদের উভয়ের থাকবে কিছু মোটামুটি আয়। অভাব কখনো ফুঁসবে না ঘরের দরজায় এসে। ঘর সাজাব নবীন প্রবীণ কলাবস্তু দিয়ে, আসর বসবে কাব্য সাহিত্য ইতিহাসের। আমার অচেনাকে ছেড়ে, চেনা সংসারের মধ্যে এক বিচিত্র সম্ভ্রম ও সাচ্ছন্দ্য চেয়েছিলাম জীবনের মূলধন হিসাবে। আমার আত্মসন্তুষ্টি দিয়ে এ সুন্দর বেড়াখানি আমি রচেছিলাম। জানিনে, আমার এ চিন্তার সামনে ওই চরিত্রের আদর্শ নিয়ে কেউ দাঁড়িয়েছিল কিনা!

"বোধহয় নয়। আমি আমার চেনা বন্ধুদের অনেকেরই ওই জীবনখানি দেখেছি। মুগ্ধ হয়েছি আর দুর্বলের পাপ মন আরো নীচে নেমেছে, শেষপর্যন্ত হিংসে করেছি।

"ভেবেও দেখিনি, কাকে হিংসে করছি।

"ওরা আধুনিক সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক কথাও বলে। আবার ভাঙ্গা প্রাচীন ঘাটের শেওলার মত ঘরোয়া জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে পুরোপুরি ফিউডাল।

ওদের জীবনের বেদনাটুকু আমি চিনতে শিখিনি। আড়ম্বর দেখে হিংসে করেছি। এই ছিঁচকে হিংসে আমাকে ওদের চেয়ে বেশী নামিয়েছে নীচে। মনে মনে ব্যঙ্গ করেছি সিনিকের মত।

"আমি যত হাত বাড়ালাম ওই জীবনের দিকে, আর যতই নাগালছাড়া হলাম, ততই আমার অতৃপ্তি বাড়তে লাগল। আমি উৎকণ্ঠিত ভীত জকির মত রেস দিয়েছি আর মনে মনে চীৎকার করেছি, ধরতে পারছিনে তো ওই জীবন। এ শঙ্কা আমার জোর ক'রে দাঁড়াবার সব শক্তিকে ঘায়েল করেছে। এ অতৃপ্তিই আমাকে অনেকখানি ভেঙ্গেছে।

পঞ্চাশ টাকার ট্যুইশানি তা-ই আমাকে শুধু ব্যঙ্গ করেছে, পাপকে গাঢ় করেছে।

"কিন্তু ভাগ্যের সব আদিভৌতিক শব্দ দিয়ে যেন আমার গোটা কাহিনীটি তৈরী হয়েছিল। সুপ্রীতির ছাত্রীটি আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে পড়া সাঙ্গ করল!'

সেই সঙ্গেই সাঙ্গ হল আমার সব সাহসের লীলা।

কিন্তু সুপ্রীতি মুখ ফুটে আমাকে কিছুই বলতে পারল না। তার চোখে দেখলাম বিস্মৃত আচ্ছন্ন দৃষ্টি। বুঝতে পারিনি, দুর্ভাগ্যের জন্য, সাময়িক বিভ্রান্তি সুপ্রীতিকে আচ্ছন্ন করেছে। আমি যত তার কাছ ঘেঁষে গেলাম, ততই যেন তাকে আনমনা, দূরে দূরে সরে যাওয়া মনে হতে লাগল। এখানে যদিও আমার রুদ্ধশ্বাস ভয় ছিল না, তবু এক ভীত-বিহ্বলতা আমাকে অসাড় করে দিতে লাগল। আর আমার ভীতি-বিহ্বল হাত ধরে, সুপ্রীতি খেতে বসাল আমাকে।

"পরদিন, রাস্তায় কনকদির মুখে শুনলাম, সুপ্রীতির ট্যুইশানিটা নেই। তবে ট্যুইশানির জন্য তো কোন ভাবনা নেই, জুটে যাবেই একটা। এবার কিছু ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী জুটে যাবে হয়তো শীঘ্রই। শুনতে শুনতে আমার বুকের মধ্যে তুমুল শব্দে কী যেন বেজে উঠল। যেন সবশেষ ছুটির ঘণ্টা উঠল বেজে। এ ছুটিও একরকমের মুক্তি। ভয়শূন্য, বিবেকশূন্য, বাধা বন্ধনহীন এক রকমের মুক্তি, যেমন কেওরার ঘরের খাঁচা খোলা শুয়োরগুলি কোনো ঘাট অঘাটের

খেয়াল মানে না। আসলে এ মহাশূন্যেরই আর এক রূপ। তারপরে হঠাৎ কনকদির চেহারাটা কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠল। 'বললেন, আপনাকে কয়েকটি কথা বলব নিখিলেশবাবু।

"বলুন।

"কনকদি একটু নীরব থেকে বললেন, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এভাবে আর চলে না। আপনি শিক্ষিত মানুষ, কিছু বলাত আমার শোভা পায় না। তবু আমার মনে হচ্ছে, আপনি গোড়ায় কিছু ভুল করেছেন।

"বললাম, কিসের ভুল ?

"কনকদি অসঙ্কোচে বললেন, আপনি একটু বেশি ভয় পেয়েছেন, সেজন্যে সহজভাবে কোনকিছু নিতে পারেননি। নইলে, আজকে বোধহয় এ অবস্থায় এসে পড়তে হ'ত না। আপনার ভয় পাওয়া দেখে সুপ্রীতিকে অনেক সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছে। কিন্তু তারো একটা সীমা আছে। বোধহয়, আমি বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি বলছি, আপনি যত চেষ্টা করেছেন, এ দুরবস্থাকে ভয় পেয়েছেন তার চেয়ে বেশি। হয়তো মনে মনে ঘৃণাও করেছেন। কিন্তু সেটাই তো জীবনের সব নয়। তাতে আপনি কাবু হয়েছেন অনেকখানি। কিন্তু সুপ্রীতি মেয়েটাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে কিনা সন্দেহ।' কনকদি'র গলা বন্ধ হয়ে এল।

"আমার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, না, না…।

"কনকদি আবার বললেন, অভাব তো মানুষকে একেবারে শেষ করে না, তার ভয়টাই মানুষকে শেষ করে। ভাই নিখিলেশবাবু, পাপ পুণ্যি, মহৎ ও অমহৎ কাজ, সব একদিন বিচার করা যাবে। এখন যা করে হোক মেয়েটাকে বাঁচান। আমিও যে মেয়েমানুষ আর তো কিছু বলতে পারিনে।

"আমি চকিতে কনকদি'র দিকে ফিরে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে কথা আমার ঠোঁটের কিনারায় এসে থমকে গেল। আমি এক পাপ উক্তি দিয়ে শপথ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু, কোন কথাই হঠাৎ 'বলতে পারলাম না। কেননা, আমার সমস্ত শুভ বুদ্ধি দিয়েও তো কনকদি'র কথাগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারিনি। আমার মনে হচ্ছিল, দুয়ে দুয়ে চারের মত, কনকদি'র কথার

সঙ্গে হরিদাসের কথাগুলি, গুণগত মাপে এক হয়ে গেছে। আমি শুধু বললাম কনকদি আমি বড় ভীরু, দুর্বল।

"কনকদি: না ভাই, আপনি ভীরু নন। আপনার সব বিষয়ে সংশয় বড় বেশি। এ সবই হতাশার কারসাজি। ওর চেয়ে বড় বিষ আর কিছু নেই।

"কনকদি আঁস্তাকুড়ে বীজ ফেলছিলেন।

"দুদিন পরেই সন্ধ্যাবেলা সুপ্রীতি বুকের ব্যথায় চৈতন্য হারাল। কী ভাগ্যি, আমি বাড়িতে ছিলাম। তখনো সুপ্রীতির পাঁজরের কাছে তার একটি রুগ্ন হাত রয়েছে। সে আমার ডাকে যতই সাড়া দিতে গেল, ততই যেন বিষম-খাওয়ার বেগে ঢোঁক গিলতে লাগল। মিঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে, আমি আরো অসহায় বোধ করতে লাগলাম।

"এমন সময় দরজার কাছে ছায়া দেখে চমকে তাকিয়ে দেখি, হরিদাস। এখন বুঝতে পারি, কিছুদিন থেকে হরিদাস ছায়ার মত ফিরছে আমার পিছনে পিছনে। চোখাচোখি হতেই সে বলল, ওকে ডেকে কিছু হবে না। এখন যাকে ডাকতে হবে, আমি তাকেই ডেকে নিয়ে আসছি।

"সভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে?

"হরিদাস ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ডাক্তারকে।

"অন্তরে প্রতিবাদ থাকলেও, আমি যেন উদ্ধারের পথ পেলাম একটি। একটু পরেই হরিদাস একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার দেখলেন, মুখ গম্ভীর করে ইনজেকশন দিলেন। আমি হরিদাসের দিকে তাকালাম। হরিদাস নির্বিকার চোখে তাকিয়ে রয়েছে ইনজেকশনের নীডলের দিকে। আশ্চর্য! আমার প্রাণে কোন সংশয় ছিল না যে টাকাটা হরিদাসই দিয়ে দেবে।

"ডাক্তার বললেন, সাতদিন অন্তর এই ইনজেকশন দিতে হবে মাস দুয়েক। এঁর প্লুরিসি বেশ এ্যাকুইট অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। চিকিৎসা বন্ধ না থাকলে হয়তো ভাল হতেন এতদিনে। কয়েকটি ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি, রীতিমত খাওয়াবেন। এখন জ্ঞান হবে আধঘণ্টার মধ্যেই।

"তা ছাড়া বিশ্রাম, খাওয়া, যত্ন অনেকগুলি কথা একসঙ্গে বললেন ডাক্তারবাবু। তারপর, আমার স্থবির চোখের সামনেই, হরিদাস টাকা দিল ডাক্তারকে। ডাক্তার বিদায় হলেন।

"মিঠু তাকিয়েছিল হরিদাসের দিকে। হরিদাসও। তারপর দুজনেই হেসে উঠল। মিঠু নিজেকে লজ্জায় আড়াল করল আমার পিছনে। আসলে এই ফাঁকে হরিদাস তার কথা শানাচ্ছিল মনে মনে।

"বলল, কাল কী করবি নিখিলেশ?

"বুকের মধ্যে ধ্বক ক'রে ওঠল! কাল কী করব। কিছুই তো করার নেই।

"হরিদাস আবার বলল, আমি যা বলেছিলাম—

আমি ভয়ে কুঁকড়ে উঠলাম। আগে তাকিয়ে দেখলাম সুপ্রীতিকে। বললাম, হরিদাস এখন থাক।

"হরিদাস বললে, না, থাকবে না। ওর জ্ঞান হতে এখনো আধঘণ্টা দেরি আছে। তার আগেই আমি চলে যেতে চাই। থাকলে আমি ওর সামনেই সব বলব।

"পাপ যখন তার শেষ শিখরে ওঠে, তখন তার মধ্যেও এক ভয়ানক দৃঢ়তা দেখা যায়। ন্যায়ের চোখে দেখা দেয় সংশয়। আর হরিদাসের এ সাহস জুগিয়েছে তার মীরগাঁয়ের সাফল্য। তখনো পর্যন্ত যেটা জানতাম না, সেটা হল মীরগাঁয়ে গিয়ে সে সব আটঘাট বেঁধে এসেছে। কোথাও এদিক ওদিক হতে দেয়নি।

"হরিদাস যেন কত সহজ নির্বিকার গলায় বলতে লাগল, জীবনযুদ্ধে কিছু ছলবল কৌশলের দরকার হয় মহৎ মানুষেরও। কারুর কাছে তা পাপ, কারুর কাছে কর্তব্য। সুপ্রীতিকে কোথায় এনে ফেলেছিস, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার কিছু নেই।

"আশ্চর্য! হরিদাসকে চুপ করতে বলতে পারলাম না। বরং ওর কথার দিকে আমার কাণ গেল আপনি আর সজাগ চোখ রইল সুপ্রীতির দিকে।

"হরিদাস আবার বলল, মাধব বাঁড়ুজ্জের মেয়ে আর সম্পত্তি পড়ে থাকবে না। কোন মাতাল বেশ্যাসক্ত সয়তানের খরচ যোগাবে সেই বিশাল সম্পত্তি।

আমি চেয়েছিলাম, ভোগ নয়, পাপ নয়, এদের বাঁচাবার কাজে লাগুক সেটা। এটা কি কোন কাজ নয়? সুপ্রীতির প্রতি ভালবাসা তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

"আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম, ভালবাসা!

"হরিদাস: হ্যাঁ, ভালবাসা। হয়তো একটু স্বার্থপরের ভালোবাসা এটি, কিন্তু মূঢ়ের মত ভালোবাসার কোন গোঁড়ামি নেই এতে। আর যা-ই হোক, মাধব বাঁড়ুজ্জের মেয়ে সুপ্রীতিকে তো কাড়তে পাবে না তোর মন থেকে।

বলে, হরিদাস নিঃশব্দে হেসে উঠল। পরমুহূর্তেই শক্ত হাতে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল দরজার কাছে। বলল, সব অপরাধের জন্য আমাকে একদিন যা খুশি শাস্তি দিস। কেউ জানবে না, দেখবে না। কাল সকালেই আমার সঙ্গে মীরগাঁয়ে যাবি।

"পকেট থেকে টাকা নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিল সে। বলল, তোর জামাকাপড় রাখব আমি। সকালে আসব গলির মোড়ে। টাকা দিয়ে যাবি সুপ্রীতিকে। বলে যাবি, দূরে যাচ্ছিস ইণ্টারভিউ দিতে।

বলে, একটি কিম্ভূতকিমাকার ছায়া ফেলে অদৃশ্য হ'ল হরিদাস। মিঠু তাকিয়েছিল অবাক হয়ে।

"তুমি হয়তো ভাবছ, একি হ'ল। একি সেই নিখিলেশ।

"হ্যাঁ সেই নিখিলেশ। ভাবছ, জীবনে যার এত ভয়, এত সংশয়, এখন কি তার একটু ভয় হ'ল না। পাপপুণ্য ন্যায়-অন্যায় যাক রসাতলে। শাস্তি ও অপমানের ভয়ও কি নেই? কথাটা আমারো মনে ছিল। কিন্তু সাহস বস্তুটি বড় বিচিত্র। পাপীর চেয়ে ভীরু আর কেউ নেই। আবার পাপীর দুঃসাহস দেখে মানুষ কাঁপে।

"এত কথা কেন লিখছি তোমাকে। আমি তো কথার আগে আলাপেই সব ব্যক্ত করেছি তোমাকে, তবু লিখছি। কথায় বলে, গানের চিতেন লাগল। মধ্যরাত্রের মাতালের আসর এবারই তো জমছে। যখন রুচি শুচি সব গেছে, বাকি আছে করুণ অথচ মদমত্ত ভাঙা গলায়, জ্ঞান হারাবার আগে শেষ চিতেন দেওয়া। বারাঙ্গনার ঘরে সে হ'ল মহামাতন, অন্যত্র শ্মশানযাত্রার

কান্না। প্রাক-মৃত্যু অবসাদগ্রস্থ বারবাসরের কুকুরেরা তখন শব খায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

"আমার চোখের সামনে, শীত-শেষ ফসলের পাঁশুটে বর্ণের মাঠগুলি ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। বুড়ো পালংএর মাঠ বীচিভরা কাঠিসার, এখন যেন কুটোকাঠির জঞ্জাল। কড়াইশুঁটী আলুক্ষেত রিক্তপ্রায়। বাতাসে এখন ধুলো উড়ছে। পাতাহীন ন্যাড়ান্যাড়া গাছগুলি যেন পিতৃদশাগ্রস্থ। কেবল উত্তপ্ত বাতাসে আগুনের শিখার মত নাচছে কৃষ্ণচূড়া শিমুলফুল। যেন নীল আকাশটার গায়ে রক্তাক্ত ক্ষত।

"ট্রেনের জানালা দিয়ে বাতাস এসে এলোমেলো করে দিচ্ছে সব। দূর গ্রামের হাজা মজা পুকুরের জলের গন্ধ বাতাসে। পথের ধারে ধারে রূপসার গন্ধহীন নামহীন ফুলগুলি ফুটে রয়েছে রূপোপজীবিনীদের মত! আমার পাশে বসে রয়েছে হরিদাস। হঁ্যা, আমি মীরগাঁয়ে চলেছি হরিদাসের সঙ্গে। ভেবেও দেখিনি, এমনি করে কতক্ষণ যেতে পারব, কতটুকু আমার দৌড়। লুপ্ত হুঁস্ নিশির ঘোরে চলেছি ; আর আমার কাণের কাছে মন্ত্র পড়ছে হরিদাস। ফিস্‌ফিস্ করে, গুন্‌গুন্ করে মন্ত্র ছুঁড়ে মারছে, কেমন ক'রে আমাকে কথা কইতে হবে, কেমন করে হাসতে হবে, চাইতে হবে। আমার প্রতিটি পদক্ষেপ তার মন্ত্র দিয়ে তৈরী ক'রে দিচ্ছে। সে মন্ত্র মিশছে আমার রক্তে চুঁইয়ে চুঁইয়ে।

"কনকদি আমার অনুপস্থিতিতে দেখাশোনা করবে সুপ্রীতিকে! সুপ্রীতি তার রুগ্ন চোখে অনেক আশার আলো ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় ইণ্টারভিউ? বলেছি, বর্ধমানের কমিউনিটি প্রজেক্টে। চোখের দিকে তাকিয়ে বলিনি। কেবল ওর রুগ্ন ঠোঁট মুখ আমার বিষ চুমোয় দিয়েছি ভরে।

"আঃ, কী শুকনো বাতাস! গাড়ির গায়ে, মাকড়সার জালে ধুলো ভরে যাচ্ছে! সেই যোগেন গাঙ্গুলির ভাইপো যাচ্ছে। পরের বাড়িতে পা টিপে টিপে যে মানুষ হয়েছে। আদরে, খাওয়ায়, পরায় যে শুধু মনে মনে আউড়েছে, একদিন বড় হয়ে খালি খাব, আর এত জামাকাপড় পরব, আর সবাইকে কাঁচকলা দেখাব। খুব শোধ নেব। যেমন করে হোক।

"যেমন করে হোক, আজ সেই শোধ নিতে চলেছি। সেই পরের বাড়ি মনটাকে পরগাছা করেছি। সেই পরগাছা মনটা আজো পেছন ছাড়েনি।

"এক একটি করে স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছি, আর ক্রমে যেন আমার সমস্ত কিছুর সমাধি ঘটছে। তারপরে মীরগাঁ। হাওড়া থেকে সোয়া তিন ঘণ্টা লোকালে লাগে। হরিদাস বলল, নামতে হবে এবার।

নামতে হবে। এমন নামা আর কেউ কোনদিন নামেনি। গঙ্গা নামেনি এমনি করে। নালা নর্দমাও নয়। দুর্ভাগ্য ম্যাকবেথের নামার মধ্যেও এর চেয়ে অনেক রাজকীয় বিভীষিকা ছিল।

"ছোট্ট স্টেশন। গার্ড ঘণ্টা মারারও অপেক্ষা করেন না। গাড়িটা চলে যেতেই ভীষণ নিঝুম মনে হতে থাকে চারদিক। দু-একটি খাবারের দোকান। আসলে তেলেভাজার দোকান। বাতাসার রসে ভেজানো লালচে রসগোল্লা দেখা যায় পেতলের গামলায়। আর পান বিড়ি চায়ের দোকান এক আধটি। ভদ্রলোক দেখে দোকানদারেরা একটু উৎসুক চোখে তাকাল। কেমন যেন ঘুম ঘুম, ছন্নছাড়া, রিক্ত।

"হরিদাস অদ্ভুত গম্ভীর। ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদরে, তাকে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমেছি। স্টেশন থেকে নামতে গিয়ে থমকে গেলাম। হঠাৎ মেয়ে গলার খিল্‌খিল্‌ হাসিতে কেঁপে উঠল বুকের মধ্যে। তাকিয়ে দেখলাম, আমাদেরই কিছু সহযাত্রিণী। বোধহয় আদিবাসী ক্ষেতমজুরণী। হঠাৎ কিসের জন্য ওদের বড় হাসির ধুম লেগেছে।

"কিন্তু আমার অসাড় প্রাণ উঠেছে কেঁপে। সুপ্রীতি কি এমন করে কোনদিন হেসেছে। এমন তীক্ষ্ণ কেটে কেটে বসা হাসি। আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, হরিদাস!

"জবাবে শুনতে পেলাম একটি গ্রাম্য অমায়িক গলা, আসুন, পেন্নাম নিন। সকালেই কত্তা খবর পেয়েছেন, আপনারা আসছেন।

"তাকিয়ে দেখি, স্টেশনের নীচেই, ফতুয়া গায়ে একটি মধ্যবয়সী লোক। খানিকটা দোকানদারের মত। আমাকেই দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

"হরিদাস নীচু গলায় বলল, মাধব বাঁড়ুজ্জের গোমস্তা।

"সামনেই একটি গরুর গাড়ি, বেশ ছটফটে বিশাল দুটি শাদা বলদ। গাড়োয়ানও আমাকে আর হরিদাসকেই দেখছিল। ছইয়ের মধ্যে বিছানা পাতা। গোমস্তা বলল, উঠুন।

"হরিদাস বলল, এই তো মাইলটাক রাস্তা। এর জন্যে আবার—

গোমস্তা : আজ্ঞে তা বললে কি হয়? বাবুদের মটরগাড়িও আছে, আগের-কালের মটরগাড়ি। ড্রাইভার নেই। রথী নেই, রথ চালাবে কে? থাকলে তাই পাঠাতেন। হেঁ হেঁ হেঁ, উঠুন। তবে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হয়েও ভাল রাস্তা-ই পাওয়া যাবে। বিশেষ কষ্ট হবে না।

"এখানে গাছে পাখীর জটলা। যে পাখী কলকাতায় দেখতে পাইনে, সেই কোকিল, বউ কথা কও পাখীগুলি নির্লজ্জভাবে কামনাদ করেছে। হরিদাস বলল, ওঠ নিখিলেশ।

"নিখিলেশ! মনে হ'ল, যেন বহুদিন বাদে ওই নামটি শুনছি। বহুদিন বাদে, সুদীর্ঘ দিনের অবসাদ অচৈতন্য থাকার পর, আচমকা নামটি শুনে ফিরে তাকালাম হরিদাসের দিকে।

"হরিদাস আমার চোখে কী দেখতে পেল জানিনে। চোখে তার সাবধানী ইঙ্গিত। আমার হাত ধরে একটু চাপ দিয়ে বলল, ওঠ।

গোমস্তা বলল, হ্যাঁ, উঠুন, উঠে পড়ুন।

"উঠতেই বলদ দুটি দৌড়ুতে আরম্ভ করল। আর গাড়োয়ানের গলা দিয়ে, জোয়ান বলদ দুটির উপর কতগুলি বেসামাল উক্তি শোনা গেল।

"গোমস্তা বলল, আপনাদের পৈতৃকভিটে কোথায় বলেছিলেন? চোতখণ্ডে, না? বেশি দূরে নয়। এখান থেকে বর্ধমান ইস্টিশান ধরুন কোশ দেড়েক, সেখান থেকে চোত্‌খণ্ড হবে প্রায় কোশ চারেকের বেশি।—লোকটি নিজেই বক্‌বক্ করছে। বুঝতে পারলাম, হরিদাস আমার নাড়িনক্ষত্র জানে। ট্রেনে আসতে আসতেই সে আমাকে বলেছিল, আমি তোর খুড়ো, যোগেন গাঙ্গুলি। ভুলেও যেন হরিদাস বলে ডাকিস্‌নে।

"গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হয়ে, ধুলো উড়িয়ে চলল গাড়ি একটি চওড়া শড়কের ওপর দিয়ে। ছোট একটি মাঠ পার হয়ে, বাঁশঝাড়। কয়েকটা খড়ো ঘর,

একটি চারচালা শিবমন্দির, তারপরে সেকেলে একটি পাঁচীল। পাঁচীলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে, গাড়ির চাকার শব্দ দ্বিগুণ হয়ে উঠল। বলদের খুরে ঘোড়ার পায়ের মত খট খট শব্দ হতে লাগল।

"আমার বুকের মধ্যে কাঁপছে। হাত পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বুকের আর গাড়ির শব্দ একাকার হয়ে খালি যেন বলছে, এখনও সময় আছে, এখনো সময় আছে, এখনো, এখনো—"

"গোমস্তার গলা শোনা গেল, হ্যাঁ, একেবারে ঢুকে পড় দেউড়ী দিয়ে, বারবাড়ির উঠোনে গিয়ে ওঠ্।

"আমরা কাৎ হ'য়ে পড়লাম একদিকে। গাড়িটা বেঁকে গেল দেউড়ীর ভিতর দিয়ে। সামনে একটি একতলা বাড়ি, পেছনে পাঁচীল। পাঁচীলের ওপারে সেকেলে উঁচু দোতলা বাড়ি।

"এখানেও নিঝুম। গাড়োয়ান বলদ দুটো জোয়াল মুক্ত করল। গোমস্তা বলল, নেমে আসুন।

বলেই সে একমুহূর্তের জন্যে ছুটে গেল ঘরের দিকে।

"আবার নামা, আরো নামা। হরিদাসের হাত চেপে ধরলাম। বললাম, হরিদাস, এখনো সময় আছে, ফিরে চল ভাই।

"হরিদাস শুধু বলল, হরিদাস নয়, যোগেন গাঙ্গুলি। ভাই নয়, খুড়ো। ঘোমটা টানার কোন উপায় নেই আর, নাচতেই হবে।

"নাচতেই হবে। দড়িবাঁধা নোলক পরা বাঁদরীর মত।

"সামনের ঘর থেকে আর একটি লোক বেরিয়ে এল। তার গায়ে ঢিলা ফতুয়া, ধুতি আর পায়ে খড়ম। ঘরটির দুপাশে দুটি তক্তপোশে, কাঠের বাকস, দোয়াত কলম, মোটা মোটা খতিয়ান।

"পেছনের ঘর থেকে প্রৌঢ় আর একজন বেরিয়ে এলেন। পায়ে চটী, গায়ে একটু লালচে মোটা পৈতা। দোহারা মানুষ। মাথায় বড় কাঁচা পাকা চুল। চোখের দৃষ্টি কোমল, হসিটি অমায়িক। হাত দুটি বুকে ঠেকিয়ে বললেন, আসুন, আসুন। আর একটু সকাল সকাল বেরুলে, সকাল সকাল আসতে পারতেন। যা রোদের তেজ! হরেন, পা ধোয়ার জল দিতে বল।

"হরেন হ'ল সেই গোমস্তা। বলল, আজ্ঞে, এই যে বারান্দাতেই সব আছে, জল ঘটি গামছা!

"হরিদাস বলল, আসব কি বলুন। অফিসের ছা'পোষা কেরানী, ছুটি পাওয়াই মুশকিল। শনি রোববারে তো নয়। নিখিলেশ!

"নামটা যত শুনি, তত চমকাই! ফিরে তাকাতেই হরিদাস বলল, ইনি মাধববাবু, প্রণাম কর।

"চোখ তুলতে পারছিলাম না। ভদ্রলোক যেন আমাকে দু'চোখ দিয়ে গিলছিলেন। মনে পড়ছে হরিদাসের কথা, এখনো আমাদের কঠিন পরীক্ষা বাকী। মাধব বাঁড়ুজ্জের সবদিক দিয়ে সন্দেহ দূর করা চাই। যদিও বাজার গরম করেই রেখেছি আমি।

"বোধহয় প্রথম দৃষ্টিতে আমাকে ভাল লেগেছিল মাধববাবুর। হেসে তাকালেন আমার দিকে। আমি প্রণাম করলাম। বললেন, থাক থাক বাবা।

"বলেও কিন্তু আমার মুখের দিকে রইলেন তাকিয়ে। আমার বুকের স্পন্দন গণ্ডগোল হয়ে গেল। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কপালে। মাধববাবু হরিদাসকে বললেন, আপনি যা বলেছিলেন, তার চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ লাগছে কিন্তু।

"হরিদাস অদ্ভুত অমায়িক গলায় হা হা করে হেসে উঠল। ঠাট্টার সুরে বলল, ভয় নেই বাঁড়ুজ্জেমশাই, ভাইপো বলে ছেলেমানুষ ধরে আনিনি। ওর এম. এ. পাশের সংবাদ আপনি নিজেই সংগ্রহ করেছেন। আমিও যোগেন গাঙ্গুলী, ভাইপোর জন্মকুষ্ঠি মায় সার্টিফিকেটটি পর্যন্ত নিয়ে এসেছি।

"মাধববাবু লজ্জিত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ছি, ছি, যোগেনবাবু, কী যে বলেন! আপনারা এসেছেন ছুটিতে এতখানি, তাইতেই আমি কৃতার্থ। আমারই তো আপনার কলকাতার বাসায় আজ যাওয়ার কথা।

"তোমার হয়তো মনে হচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটি মোড় নিয়ে ফিরে গেছে একটি শতাব্দীর পিছনে। সেকথা বলেছি আলাপের ফাঁকে। সমস্ত ঘটনাটা শুধু নয়, গোটা চিত্রটাই যেন গত শতাব্দীর। গত শতাব্দীর একটা পচা কাহিনী পুরনো নোনাধরা ষড়যন্ত্র।

"তখন আমিও অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আজো বাংলা দেশের গ্রামে এমন ঘটনা ঘটে। আমরা শহরে বসে জীবনকে যতখানি দ্রুতগামী মনে করেছি, সে শুধু রথের প্রথম ঘোড়া দেখে। তার পেছনের বোঝাগুলি দেখিনি। সেদিক থেকে, হরিদাসেরা এদেশ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে ওয়াকিবহাল।

"হাতমুখ ধোয়ার পর জলযোগের ব্যবস্থা। কিন্তু মুখের সামনে সমস্ত খাবারগুলি কেন যেন শুধু বমির উদ্রেক করছিল। বিড়ি সিগারেট কোনদিন খাইনি। এখন আমার তা-ই খেতে ইচ্ছে করছে।

"অসমসাহসী ও নিষ্ঠুর হরিদাস। আশ্চর্য! সেও কিন্তু এখন খেতে পারছে না। ভেতরের সংগ্রাম তাকেও দিচ্ছে না সহজ হতে। আমার হাত পা সব কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

"একটু পরেই একে একে কয়েকজন প্রতীবেশী বয়স্ক ব্যক্তির আগমন হতে লাগল। তামাক পুড়তে লাগল ঘন ঘন। আর সন্ধানী তীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টি আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে তুলল।

"একজন প্রতিবেশী বলল, সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা, জানেন যোগেনবাবু। চোতখণ্ডে গেছি আমার ভাগ্নির জন্য ছেলে দেখতে। সঙ্গে আমার ভগ্নিপতি। মশাই ছেলে তো দেখলাম, পছন্দ হ'ল না। বড্ড বুড়ো বুড়ো ঠেকতে লাগল। পথে একজনের কাছে শুনলাম নগেন গাঙ্গুলীর ছোট ভাই যোগেনকে একবার দেখে গেলে হয়। আমার ভগ্নিপতি বললেন, শুনেছি ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ, কিন্তু দেনার দায়ে পৈতৃক ভিটেটুকুও বাঁধা। ওঘরে আমি মেয়ে দেব না। তা হলে ভেবে দেখুন আজ কী হ'ত।

"ঘরময় সকলেই হেসে উঠলেন। পরমুহূর্তেই সব নজরগুলি ফিরে এল আবার আমার দিকে।

"সেই প্রতিবেশীই আবার বলল, তবু, আপনি দুঃখ কষ্ট করেও যে ভাইপোটিকে বেশ দিগগজ করেছেন, এইটি বড় ভাল কাজ করেছেন।

"হরিদাস লজ্জিত হেসে বলল, কী যে বলেন। সে তো কর্তব্য করেছি মাত্র।

"আর এই প্রথম, আমার সত্যিকারের কাকা, যিনি এখন ক্রুকশন্ কোম্পানীর ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে বসে পিষছেন কলম, তার প্রকৃত মূল্য আমি বুঝতে

পারছি। হরিদাস যেমন করে বলছে, আমি কর্তব্য করেছি মাত্র, আমার আসল কাকার তো এই কথাটুকুই বলবার আছে মাত্র।

"ক্রমে চোত খণ্ডের আলোচনায়, আমার হৃৎপিণ্ড ভয়ে নাচানাচি করতে লাগল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, আমার সঙ্গে হরিদাসের প্রথম দিনের দেখা হওয়ার পর, সমস্ত ব্যাপারটি অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মাধববাবুর অনুচরেরা ইতিমধ্যেই চোত খণ্ডে ঘুরে এসেছে। এবং আসলে পরাজিত হয়েছে। কেননা আমার আর হরিদাসের পরিচয় সম্পর্কে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

"তবু আমি আর এক মুহূর্তও এ ঘরে বসে থাকতে পারছিলাম না। চারপাশে জোড়া জোড়া চোখের কোনটিতে সংশয়, কোথাও নিঃসন্দেহ ভাব। সেই ঘুরে ফিরে একই কথা। আমি আর কিছুতেই টিকতে পারছিলাম না। সামনের দরজা খোলা ঘরটি, উঠোন, চালতে গাছ, শালিকের খেলা ডাক দিচ্ছিল আমাকে। জাল ঘিরে আসতে আসতে যেন এখান থেকে চুপিসারে আমি পালাতে পারি।

"হরিদাস বলেছে, আজ রাত্রেই আমরা চলে যাব। শুধু সব স্থির হয়ে গেলে আজ আশীর্বাদ হয়ে যাবে।

"আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। প্রথম ভয় পেল হরিদাস। নিজের মুখ নিজে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু নিশ্চয়ই কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। হরিদাস বলল, কোথায় যাচ্ছিস ?

"আমি বললাম কারুর মুখের দিকে না তাকিয়ে, আপনারা যদি অনুমতি করেন, আমি একটুপাশের ঘরে গিয়ে বসি।

"মাধববাবু বলে উঠলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। তারপর সকলেই, নিশ্চয় নিশ্চয় করে উঠল। আমি সামনের ঘরে যেতেই, পেছনের ঘরের জটলা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর মাধববাবু বললেন, বোধহয় শরীরটরীর খারাপ করেছে। ট্রেনে এসেছে এতটা। আর এই বুড়োদের মধ্যে…

"আবার আলাপ আলোচনা চলল। বাইরের এ ঘরটা ফাঁকা। দলিল দস্তাবেজ সব আছে, লোক নেই। জানালার দিকে তাকাতেই, ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। সুপ্রীতি! উঠে দাঁড়ালাম। আবার সেই মুখ। তার

সঙ্গে একটু হাসির নিক্কন। চোখে চোখ পড়ল। না, সুপ্রীতি নয়, আর কেউ। আর কেউ, যাঁরা সকলেই সুপ্রীতির চেহারায় ফিরছে আমার সামনে। তারপরে আর একটি মুখ, আরও একটি মুখ। দুপ্‌ দুপ্‌ পায়ের শব্দ, চুড়ি বালার রিনিঝিন, আঁচলের খস্‌খসানি।

"পরে জেনেছি, প্রথম মুখটির নাম কুসুম। মাধববাবুর মেয়ে মালতী দেবীর সখী।

"এ বিনি পয়সার একজিবিশনের পুতুল হয়ে, যতই মুখ অন্যদিকে ফেরাই, ততই যেন সারা গায়ে খোঁচাখুঁচি হতে লাগল।

"ওইতো ওইতো বাইরে উঠোন। ডান দিক দিয়ে গেলেই দেউড়ী। কোন পাহারা নেই, দরোয়ান নেই। দেউড়ী পার হলেই পাঁচীলের ধারে ধারে সোজা রাস্তা। তারপর সেই মন্দিরের পাশ দিয়ে, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পার হয়ে··· সহসা কিসের এক ধাক্কায় আমি উঠে এলাম দরজার কাছে। যেমনি এলাম, অমনি আবার চোখাচোখি। আরো সামনা সামনি অদৃশ্যের পাহারাদার চোখের সঙ্গে হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার মত। আর তার সঙ্গে বিদ্রূপের উচ্ছ্বসিত হাসি। চারদিকে নজর। বেরুবার কোন উপায় নেই।

"এদিকে ওঘরের আড্ডাটা ঝিমিয়ে গেছে যেন।

একে একে বিদায় হতে লাগল প্রতিবেশীরা। আর সবাই আমাকে, 'বেঁচে থাকো বাবা" 'যাও বিশ্রাম করগে বাবা' ইত্যাদি শুনিয়ে যেতে লাগল।

"হরিদাসের ডাকে আবার গেলাম পাশের ঘরে। মাধববাবু তাঁর পাশে বসিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কোন কথাই হ'ল না। সব তোমার খুড়ো-মশাইকেই বলেছি। তুমি বোধহয় শুনেছ বাবা, আমার মেয়েটি জন্মান্ধ।

"মনে হ'ল এঘরের আবহাওয়া অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে। আমি অসহজ হয়ে রয়েছি সেই পরিমাণেই। কিছু বলতে পারলাম না। কেবল ঘাড় নাড়লাম।

"মাধববাবু বললেন, না অমনি করে বললে হবে না। তোমারো একবার আমার মেয়েটিকে দেখা দরকার।

"আমি শিউরে উঠে বললাম, না না।

"আমার এ শিউরিনি ভাবটুকু মাধববাবুর চোখে পড়ার আগেই হরিদাস বলে উঠল, মাধববাবু, দেখাতে চান, আমার আপত্তি নেই। তবে নিখিলেশ সে জাতের ছেলে নয়। আমার মুখ থেকে সব শুনেই সে এসেছে। মেয়ে দেখতে সে আসেনি।

"মাধববাবুর কোমল দৃষ্টি করুণ হয়ে এল। বললেন, যোগেনবাবু, মেয়েটিকে জন্ম দিয়ে তার মা মারা গেছে। শিশুবয়সে সে যখন এদিক ওদিক তাকাত আর খিল্‌খিল্‌ করে হাসত, তখন স্ত্রীশোক অনেকখানি ভুলেছিলুম। কিন্তু তারপর যেদিন বুঝতে পারলুম, মেয়ে আমার চোখে দেখতে পায় না, সেইদিন আমার জীবনের সমস্তটাই গেল পালটে। আমার এই দুটি চোখ, ওরই জন্ম রেখে দিয়েছি দিবানিশি।

"হঠাৎ একমুহূর্ত নীরব থেকে আবার বললেন, অনেকেই আমাকে তখন আবার বিয়ের জন্যে ধরপাকড় করেছে। করবেই। এই বাড়ি ঘর সম্পত্তি, কে দেখবে, কার কাছে থাকবে। কিন্তু মেয়েটার দিকে তাকিয়ে পারলুমনা। মনে হ'ল ও চিন্তা করাও পাপ। ওর দুটি চোখ নেই, অন্ধ হলেও ওর জীবনে কোন দুঃখ রাখব না, এই ভাবনা রইল আমার মন জুড়ে। আমার চোখ দিয়ে দেখে দেখে মেয়ে এত বড়টি হয়েছে। যোগেনবাবু, ভাই, আমার মেয়ের দুটি চোখ চাই।

"চোখ চাই, দুটি চোখ। মাধববাবু দরজা দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন। হরিদাসের সঙ্গে চোখ মেলাতে আমি সাহস করছিলাম না।

"কেননা জানি, তার ঠোঁটের কোণে, চোখের মণিতে নিঃসংশয় সাফল্যের আগুন। কিন্তু দুটি চোখ চাই। সে কি আমার এই চোখ। মনে হ'ল আমার চোখের সূক্ষ্ম তন্ত্রাগুলি টান টান হয়ে উঠেছে। এক একটি বেসুরো টঙ্কারে ছিঁড়ে যাচ্ছে আর আমিও অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ মেয়েগলা চীৎকার করছে, তুমিও অন্ধ, তুমিও অন্ধ।

"তখনো বাইরের ঘরে উঁকি ঝুঁকি চলছে। মাধববাবু আবার বললেন, আমার টাকা পয়সা সম্পত্তির জন্য, এ আমার দাবি নয়। এ আমার ভিক্ষে, যে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে তার কাছে ভিক্ষে।

বলতে বলতে মাধববাবু সরাসরি আমার মুখের দিকেই তাকালেন। আমি জোর করে চোখ নামিয়ে রাখলাম মাটির দিকে। তিনি বলতে লাগলেন, মেয়ের বয়স হয়েছে, এবার তার বিয়ের দরকার। যে তাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসবে, তার সেই স্বামীর চোখ ছাড়া, আর কার চোখ সে পাবে।

"হরিদাস আশ্চর্য গম্ভীর গলায় বলল, মাধববাবু, জানিনে এতবড় পাষণ্ড এ সংসারে কে আছে, যে ওই মেয়েকে ভাল না বেসে পারবে।

"মাধববাবু হঠাৎ কঠিন গলায় বললেন, সে পাষণ্ডেরও অভাব নেই যোগেনবাবু আমার যদি শুধু মেয়েটি থাকত, তাহলে কথা ছিল না। আমার টাকা আর সম্পত্তিই সব কাল করেছে, বুঝলেন!

"আমি চোখের পাতা তুলতে পারছিনে। পাশে বসে মাধববাবু। ভাবলাম, হয়তো আমার বুকের কাঁপুনি টের পাবেন উনি। আমি যতই আমার হাত পা শক্ত করি, ততই যেন সব শিথিল হয়ে আসতে লাগল। এমন কি মাধববাবু আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালেন। তারপর বললেন, আপনারা কিছু মনে করবেন না, সবাই টাকা দেখে আসে, মেয়ে দেখে কেউ আসে না। জীবনটাকে ভেবেছিলাম একরকম। কিন্তু মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে, সংসারের কোন সর্বনাশকে চিনতেই আমার আর বাকি রইল না। চোর জোচ্চোর ডাকাতেরা আমাকে ঘিরে ফেলেছিল। তখন ভেবেছিলাম, না, মেয়েটার বিয়েই দেব না। বাপ-বেটীতে চলে যাব বৃন্দাবনে। যতদিন বাঁচি, দেখব। তারপরে ওর ব্যবস্থা ও করে নেবে! কিন্তু কোন শয়তানের হাতে তুলে দিতে পারব না। বলে মাধববাবু থামলেন। আর আমার মনে হতে লাগল, মাধববাবুর সঙ্গে যে তক্তপোশে আমি বসে আছি, সেই তক্তপোশটি শুদ্ধ সব কাঁপছে থরথর করে। কিন্তু নেমে যেতে পারছিনে, হঠাৎ একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে, সেই আশঙ্কায়। বুঝতে পারছি হরিদাসও হঠাৎ সংশয়ান্বিত হয়ে উঠেছে। তবু সে আশ্চর্যরকম ধীর গম্ভীর। আমি এখনো পাপের সেই দৃঢ়তাকে আয়ত্ত করতে পারিনি। যদি হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারতাম আমার সমস্ত স্নায়ুগুলিকে, তাহলে বোধহয় অনেকখানি শক্ত হতে পারতাম। আমার সারা মুখ ঘামে ভাসতে লাগল।

"হরিদাস বলল, মাধববাবু, বাঘ ভালুক মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু সে বনে। মানুষের আসল শত্রু মানুষই। তাই বলি, আপনার মন যতক্ষণ সায় না দেয়, ততক্ষণ বিয়ে দেবেন না মেয়ের।

"আশ্চর্য রকম কথা বলতে জানে হরিদাস। এই কথা দিয়ে তার মনকে একটুও বোঝবার উপায় নেই।

"মাধববাবু বললেন, কিন্তু মন তো মানেনা যোগেনবাবু। মেয়েটার জীবন এভাবে ব্যর্থ করে দিই কেমন করে বাপ হয়ে! নিজের স্বামী ছেলে পুলে হলে আর তো কোন ভাবনা থাকে না ওর। তাই আপনি যখন নিজে যেচে এসে বললেন, মশাই ভাইপোটিকে মানুষ করেছি মোটামুটি। ও আমার বড় আদরের ধন। টাকাপয়সা সম্পত্তি আপনি যাকে খুশি দিয়ে যান, আমার ভাইপোটি সুখে থাকলেই হ'ল। ভাইপো আমার সাতে পাঁচে নেই। বিয়ের দরকার, বউকে ভালবাসবে আর চিরকাল লেখাপড়া করে কাটাবে, এই আমি চাই। শুনে আমার ভাল লাগল। আমার মেয়েকেও আপনার ভাল লাগল। আপনি যখন আত্মপরিচয় দিলেন, গোপন করব না, তখুনি আমি লোক পাঠালাম চৈত্রখণ্ডে। সেইজন্যেই আপনাকে আমি তখন একরাত্রি রেখে ছিলাম। সেইজন্যেই আপনার ভাইপোকে আমি দেখতে চেয়েছিলাম···

"হরিদাস অদ্ভুত কেসে হঠাৎ বলে উঠল, মাধববাবু, আপনি আমার দাদার মত। নিখিলের বাবা বেঁচে থাকলে, আমি নিজে আসতুম না, হয় তো আপনার সঙ্গে আমার আলাপই হত না। যাই হোক, তবু আমি বলব, সময়ের জন্যে ভাববেন না। ভাইপোকে অনেকদিন মানুষ করেছি, সওদাগরি অফিসের কলম পিষে, আরো বহুদিন পারব। আপনার যত খুশি অনুসন্ধান করে নিন, আমার কোন আপত্তি নেই। তবু মনে কোন সংশয় রাখবেন না শুভ কাজে।

"মাধববাবু বলে উঠলেন, না, যোগেনবাবু না, আমার সংশয় আর নেই। আপনি বরপক্ষ, আপনার কাছে আমি করজোড়ে থাকব। তবু যে এতকথা বললুম, আপনি বলেই বলেছি। যাকে আমার আসল দেখার দরকার ছিল, যাকে নিয়ে আমার সব, তাকে আমার ভাল লেগেছে। আর আমার কিছু চাইনে। বলে মাধববাবু আমার দিকে তাকালেন। একজন সৎ মানুষের

কোমলতা, স্নেহ, বিস্মিত প্রশংসা যে পাপকে কতখানি স্পর্ধিত করতে পারে, আমি বুঝলাম এই মুহূর্তে। মানুষ কত সহজে বিশ্বাস করে। মানুষ মানুষকে কত কম চেনে।

"মাধববাবু উঠলেন। বললেন, আমি আসছি একটু বাড়ির ভেতর থেকে। বলে তিনি পেছনের দরজা খুললেন। খুলতেই দেখা গেল, দোতলাবাড়ির ভেতরের উঠোন। একদল মেয়ে সেখানে জটলা করছিল। দরজা খুলতেই তিনদিক ঘেরা সেকেলে বাড়িটার আনাচে কানাচে চকিতে অদৃশ্য হ'ল মেয়েরা। মাধববাবু দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।

"আমি কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই হরিদাস ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারা করল। পরমুহূর্তে বহু গলার ফিস্‌ফিসানি শুনতে পেলাম আশেপাশে। যেন রুদ্ধকক্ষ অন্ধকার নরকের অসারিরী আত্মারা ঘিরে এসেছে চারদিক থেকে। গলায় ব্লেড বসিয়ে মরা সেইসব আত্মারা, কথা বলতে গেলে যাদের কণ্ঠনালীর ফুটো দিয়ে বাতাসের মত বেরিয়ে আসে সব শব্দ। হাতে হাতে তাদের ধারালো ব্লেড। প্রত্যেকে রসিয়ে রসিয়ে, একটু একটু করে কাটবে আমার কণ্ঠনালী। আমি গলায় হাত দিলাম।

"তুমি ভেবে নিতে পার, মাধববাবু তখন অন্দরমহলে তাঁর দিদি অন্নপূর্ণার কাছে সাড়ম্বরে আমার রূপ গুণ প্রকাশ করছেন। মাধববাবুর গলায় মুগ্ধতা। অন্নপূর্ণা ভাবছিলেন, যেন ভগবান মুখ তুলে চান। আর সেই কথাগুলি আরো একজন শুনছিল পাশের ঘরে, সখী কুসুমের কাছে দাঁড়িয়ে। চোখে তার অন্ধকার। হৃদয় তার হঠাৎ আলোর ঝলকে কাঁপছে থরোথরো।

"মাধববাবু আবার এলেন। বললেন, যোগেনবাবু, এবার দয়া করে বাড়ির ভেতরে আসুন। আজকের রাতটা কিন্তু থাকতে হবে। কাল সকালে আশীর্বাদের প্রশস্ত সময় আছে।

"আমি ভীত চোখে হরিদাসের দিকে তাকালাম। হরিদাসও একবার চোরা চোখে আমার দিকে তাকাল, বলল, কাল সকালেই না হয় আমরা আবার আসব কলকাতা থেকে। আমারো তো মেয়েকে আশীর্বাদ করতে হবে। টাকাকড়ি তো আনিনি তো।

"মাধববাবু: সেজন্যে আটকাবে না। আপনিও কালকেই করবেন আশীর্বাদ। আজকের রাতটা থাকতেই হবে দয়া করে।

"কিন্তু আবার রাত্রিবাস কেন? হরিদাসকেও এক রাত্রি আটকে রাখা হয়েছিল, চৈত্ররথেও সত্যমিথ্যা অনুসন্ধানের জন্যে। হয়তো আবার কোন সত্যমিথ্যার পরীক্ষার জন্য এই আটক। ভয়ে আমার বুকের মধ্যে ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করতে লাগল।

"আমার গলা দিয়ে হঠাৎ একটি দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে গেল। মাধববাবু ফিরে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, তুমি কিছু বলছ বাবা?

"হ্যাঁ, মনে মনে বলছিলাম। কিন্তু মুখ ফুটে এখন কিছু আর বলতে পারলাম না। বরং বলতে হ'ল, আজ্ঞে না।

"মাধববাবু: বুঝতে পারছি, তোমার হয়তো অস্বস্তি হচ্ছে, আত্মসম্মানেও লাগছে এখানে থাকতে। কিন্তু সেসব ভেব না। তোমার অসম্মান হয়, এমন কোন কাজ আমি করব না। বিদেশের মানুষও তো দুদিন আমার বাড়িতে অতিথি হতে পারে।

"আমি বললাম, তা তো বটেই।

"হরিদাস ইতিমধ্যে তার কর্তব্য স্থির ক'রে নিয়ে বলল, অবশ্য অফিসে আমি সাতদিনের ছুটী নিয়েই এসেছি।

"মাধব: তবে আর কি। কলকাতায় গৃহিণী দুশ্চিন্তা করবেন?

"হরিদাস: না না, তাঁকেও আমার বলা-ই আছে, দুচারদিন দেরি হতে পারে ফিরতে।

"হরিদাস গৃহিণী! বীণাদি? সেই মুখ ভেসে উঠল আমার সামনে। বীণাদি তেমনি বিষন্ন হেসে, অথচ তিক্ত গলায়, আমার দিকে চেয়ে যেন বলছেন, নিখিলেশ, তুমি! ভেবেছিলুম কলকাতার মাতাল আর জুয়াড়ি ছাড়া তাকে আর কেউ চেনে না। কিন্তু তুমি নিখিলেশ এত ভাল করে চিনলে কী করে?

কী করে চিনলাম! যেমন করে পাপী পাপকে চিনতে পারে। এতো মুখে মুখে, কথায় কথায় চেনা নয়। তলে তলে, রক্তস্রোতের মধ্যে এ চেনাচেনি।

এ চেনাচিনির চেহারা সমাজের ওপর থেকে কোনদিন বোঝা যায়নি। যাবে কী করে। আমি যে সেই শ্রেণীর বাঙালীর ঘরের ভাল ছেলে ছিলাম, যাদের শিক্ষাদীক্ষা, পোশাক, ব্যবহার দেখে, নিজেরাই নিজেদের হৃদয়ের দুর্বলতার চেহারা চিনত না।

"কই, নিখিল, চল।

"চমকে উঠলাম হরিদাসের ডাক শুনে। এইবার ভেতরে যেতে হবে। মাধববাবু বাইরের ঘরে উঁকি দিয়ে বললেন, কই হে নীলু, তুমি একবার দিদির সঙ্গে দেখা করে জেনে নিও, কী সব যোগাড় টোগাড় করতে হবে।

"নীলু ওঁর আর এক গোমস্তার নাম।

"দরজা খুলে ভেতরে বাড়ির উঠোনে ঢুকলাম। সেই মুহূর্তে একটি কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস এসে যেন শীত ধরিয়ে দিল। যেন বধ্যভূমিতে এসেছি। ফাল্গুনের উজ্জ্বল অপরাহ্ণ এখানে কেমন যেন ভীরু বিষণ্ণ হ'য়ে উঠেছে। তিনদিকেই উঁচু বারান্দা। ঘন থামের আড়ালে, বারান্দাগুলিতে নেমেছে অন্ধকার। থামের খিলানে, খোপে খোপে, বাসা-মৈথুন-ডিম প্রসব সর্বস্ব পায়রাগুলি বকম্ বকম্ করছে। আর অশরীরী আত্মাদের ফিসফিসানি চলছে কাছে পিঠে। যাদের চোখের সামনে চলাফেরা করতে দেখছি, কাজে ও পোশাকে মনে হচ্ছে, তারা ঝি চাকর। ঢুকে ডানদিকের একটি ঘরে নিয়ে গেলেন মাধববাবু। সেই ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে উত্তরদিকে অনেকগুলি ধানের গোলা। ঘোরাঘুরি করছে দুচারজন কিষেণ। বোধহয় বোরো ধানের চাষ হচ্ছে, সেজন্যেই এসময়ে কিষেণের ভিড় দেখা যাচ্ছে।

"তারপর আলো জ্বালার পালা চলল। দুপুরের দিকে প্রতিবেশীর যাতায়াতটা ছিল মাত্র ভূমিকা। এইবারই তার আসল শুরু হ'ল। মাধববাবুর শালা থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা চলল মুহুর্মুহু। হরিদাস আগেই নাকি পাঠিয়ে দিয়েছিল আমার ঠিকুজিকুষ্ঠি। আমার ঠিকুজিকুষ্ঠি! জানিনে, আমার জন্মের পর তা কোনদিন হয়েছিল কিনা। হয়ে থাকলে কবেই তা আমার পৈতৃক ভিটেমাটীর সঙ্গে চাটি হয়ে গেছে। জানিনে, কেমন করে হরিদাস এসব তৈরি করেছে।

"খড়ম পায়ে চাদর গায়ে এক পণ্ডিত এলেন চেঁচাতে চেঁচাতে, কই হে মাধব, রাজযোটক হে, রাজযোটক।

"পরিচয় হ'ল। পণ্ডিত বললেন আমাকে, তোমার মধ্যে বাবা ক্ষণজন্ম পুরুষের লক্ষণ রয়েছে। স্ত্রী ভাগ্যে ধন, এতো আমার বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু তুমি একটা নিদারুণ কিছু করবে।

"হরিদাস এতক্ষণ ছিল খানিকটা তালকানা তবলচির মত। ধরতাইয়ে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। এখন যেন ধরতাই তার হাতের মুঠোয়। সে বলল, সেসব কি আর না দেখেই এসেছি ভটচাযমশায়।

"আর হরিদাসের তৈরি ওই ঠিকুজির আগেই আমি জানি, আমি নিদারুণ কিছু করতে যাচ্ছি। সেই নিদারুণের কোন পরিমাপ নেই।

"সবাই শুধু বেশ বেশ করছিল। এই বেশ বেশ শুনতে শুনতে আর এক 'বেশ'-এর কথা মনে পড়ে গেল। আমি নয়, নিখিলেশ গাঙ্গুলির যেদিন সুপ্রীতির সঙ্গে রেজিস্ট্রী করে বিয়ে হয়েছিল, সেইদিন রেজিস্ট্রার বলেছিলেন, বেশ! বেশ! বন্ধুরা বলেছিল, বেশ বেশ!

"আর সারাদিন, আত্মীয়স্বজনহীন সেই বিয়ে, একদিকে তার বেদনার গুরুভার, আর একদিকে আনন্দ, ভাবনা ঘোরাঘুরি, ছুটোছুটি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, সব মিলিয়ে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘরে এসে, খাবার আগে, চেয়ারে বসে হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়েছিলাম একটু। আচমকা ঘাড়ের কাছে কোমল স্পর্শে চমকে তাকাতেই দেখি, সেই মুখ। ঠোঁটের কোণে যার প্রাণ ভোলানো বৈরাগিনীর হাসি। ভ্রূ কাঁপিয়ে, বলেছিল, বেশ।

"সেই প্রথম! অসহ্য আনন্দে আর একটু ভয়ে ভয়ে, (কেন যে ভয়, তা জানিনে) সেই মুখে আমি আমার প্রথম চুম্বন এঁকে দিয়েছিলাম। প্রথম। কেননা, আমি যে আবার অন্তরে অন্তরে ছিলাম খাঁটি ফর্মালিস্ট। বিয়ের আগে সেটুকুও ছিল আমার নীতিবিরুদ্ধ। সেই প্রথম! আর এত আচমকা যে, তারো সেই প্রথম দাগ লাগার বিস্ময়ে, চমকে, বিচিত্র হেসে আবার বলেছিল, বেশ!

"বেশ! শব্দটির মধ্যে কিসের ইন্ধন ছিল।

"আজকের 'বেশ'-এর মধ্যেও অনেক ইন্ধন রয়েছে। পাপের ইন্ধন। মনকেই সমস্ত পাপলীলাকে রক্তে রক্তে রপ্ত করে নেওয়ার প্ররোচনা। তবু, আগের বেশকে যতই ঠেলে ঠেলে দূর করতে চাইছি, ততই সে সবকিছু ঠেলে আসছে।

"তারপর রাত্রে খাওয়ার পালা। এক প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা পরিবেশন করলেন। ইনি অন্নপূর্ণা, মাধববাবুর দিদি। পাশের ঘরে অনেকগুলি মেয়েগলা শোনা যাচ্ছে। একজন এসে বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল, এক অষ্টাদশী, সেই কুসুম। অনেকবার চোখাচোখি হয়েছে তার সঙ্গে। ভয়ে চোখ নামিয়েছি বারবার।

"পরে শুনেছি, সে-ই প্রকৃত অন্ধ মালতীর অনুচারিণীর কাজ করছিল। মালতী ছিল একলা এক ঘরে। প্রবেশাধিকার ছিল শুধু কুসুমের। সে গিয়ে দৃষ্টিহীনা বান্ধবীর সামনে, নিপুণা কথাশিল্পীর মত আঁকছিল এক পুরুষমূর্তি। মালতী যখন নিঃশব্দে শুধু শুনছিল, তখন কুসুম বলছিল, রাকুসি কথা বলছিস না যে! সে যে তোর বর।

"মালতী বলছিল, ছি! ওকথা বলতে নেই।

: কেন?

: যদি না হয়।

: হবেই।

: তুই যার কথা বলছিস, ঠিক সে-ই?

: তবে কি মিছে?

শুনে মালতী কাঁদছিল। কুসুম বলছিল, আ মরণ! কাঁদছিস কেন?

মালতী অসীম লজ্জায়, আর অন্তহীন দুঃখে বলছিল, আমি কিছুই দেখতে পাইনে যে। তখন কুসুম করুণ গলায় বলছিল, না-ই বা পেলি। সে যে তবু তোরই, তোরই হবে।

"খাওয়ার পালা চুকলো। তারপর পান। তারপর খুড়ো ভাইপোর এক ঘরে দুই শয্যায় শয়ন। দরজা বন্ধ হতেই লাফ দিয়ে উঠলাম। মুখের পান দলা করে ফেলে দিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। হরিদাস আবার ঠোঁটে আঙুল চাপল। কাছে এসে বলল, যা বলবি সাবধানে, আস্তে। মনে রাখিস দেওয়ালেরও কাণ আছে।

"শুধু দেওয়ালের নয়, বোধ হয় সারা বিশ্বটারই কাণ আছে এখানে। যে কাণ মীরগাঁ থেকে কলকাতার উত্তরের শহরতলী ঘেঁসে উৎকর্ণ হয়ে আছে। মনে করেছিলাম, পাপীর সাহস দেখেও মানুষ কাঁপে। সে সাহস হরিদাসের আছে, আমার নেই। আমার লোভ আছে, বুকের কাঁপুনি আছে তার চেয়ে বেশি বললাম, হরিদাস রাতটুকু সময় আছে। চল, সরে পড়ি।

"এতক্ষণ বাদে নিবারণের দোকানের হরিদাসকে দেখতে পেলাম। বলল, খেলতে নেমে, খেলা ফেলে পালানো পুরুষের ধর্ম নয় নিখিল। এখন শুধু খেলা! যেন গুণ পাশা দিয়ে গুণিনের খেলা। হার জিতের কথা ভাবলে চলেনা নিখিল।

: আমি যে আর খেলতে পারছিনে হরিদাস।

: তবু আমি জিতিয়ে দেব তোকে। রং-এর তাস আছে আমার হাতে।

: আমি জিততে চাইনে হরিদাস। শুধু চলে যেতে চাই। যেখান থেকে এসেছি, সেখানে যেতে চাই। আমি বুঝেছি এ কাজ আমি পারব না, আমার সাহস নেই।

: আর সে সময় নেই। সাহস কারুরই থাকে না। সেটা সঞ্চয় করতে হয়।

"আমি অসহায়ের মতো বন্ধ দরজাটির দিকে তাকালাম। হরিদাস টিপে হেসে বলল, ওদিকে তাকিয়ে লাভ নেই। দরজার বাইরে আছে ষণ্ডামার্কা বাগ্দী। মারবার জন্য নয়, আমাদের রক্ষা করবার জন্যে। খুট করে শব্দ হলেও আসবে ছুটে। সুতরাং বুঝে কাজ করো।

"হরিদাস আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটা সেকেলে দেয়াল বাতি জ্বলছে ঘরে। ঘরের সমুদয় আসবাবপত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন। তারাও হরিদাসের মত টিপে টিপে হাসছে আর আমাকে দেখছে। যেন দরজাতে হাত দিলেই সবাই একযোগে চেঁচিয়ে উঠবে, ও কী হচ্ছে, ও কী হচ্ছে?

"তখনো বাড়িটা নিঝুম হয়নি। লোকজনের চলাফেরা, থালা বাসন মাজা ঘষা ধোয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর একসময়ে তাও থামল। থমথমিয়ে উঠল চারপাশ। রাতকাণা পায়রাগুলি মাঝে মাঝে পাখা ঝাপটা দিচ্ছে। দূর থেকে ডেকে উঠছে শেয়ালের পাল। বাতাস পাক খাচ্ছে চার দেয়াল

ঘেরা উঠোনে, ধাক্কা দিচ্ছে জানালার শার্সিতে, দরজায়। পাল্লায় চৌকাঠে কেবলি শব্দ হচ্ছে খুটখাট্ করে। যেন কারা রয়েছে রাত্রি জেগে আমার চারপাশ ঘিরে।

"আমি বড় চোখে ঘরটার চারপাশে তাকাতে লাগলাম। আমি তো সবকিছুর জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। যাই ঘটুক, সমস্ত কিছুর মুখোমুখি দাঁড়াব, সেই ভেবে, 'লজ্জা, ঘেন্না, ভয়, তিন থাকতে নয়' করেই পা দিয়েছিলাম পথে। কিন্তু কোথায় আমার এত অস্বস্তি অস্থিরতা ভয় ছিল লুকিয়ে। তখন তো আমি আমার এ মনকে দেখতে পাইনি।

"না, মিথ্যে কথা। মন দেখতে পাইনি, দেখবার অবসর আসেনি। আমি মোটেই তৈরি হয়ে আসিনি। আমি আমার জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পারিনি তৈরি হতে। শুধু দু' চোখ ভরে দেখেছিলাম বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট আর স্তূপীকৃত মুদ্রা। তারই ছায়া দেখে দেখে ছুটে এসেছিলাম, আসল কায়াকে ধরব বলে। আসল কায়া, যেখানে স্তূপ করা রয়েছে রাশি রাশি টাকা। আলিবাবার দাঁড়িপাল্লায় মাপা মোহর। এসেছিলাম পাগল হয়ে, সব আমি তুলব দু' হাতে সাপটে। যখের ধন পাব বলে এসেছিলাম।

"কিন্তু সে সব কোথায়! এখানে আর এক পরিবেশ। আত্মীয় স্বজন, ঠিকুজী, কুষ্ঠী, আশীর্বাদ, শুভদিন, পাঁজির দিন গণনা, সব মিলিয়ে এক দুস্তর বৈতরণী। এই দুস্তর বৈতরণীর ওপারেও তো আমার সেই যখের ধনের কোন নিদর্শন দেখতে পাচ্ছিনে! তবে? তবে এ কোন্ প্রহসনের সং সেজে এসেছি আমি!

"মনে পড়ে গেল হরিদাসের সেই কথাটি। নাচতে নেমে আর ঘোমটা টানা চলে না।

"আমি যে আমার সব ভাবনা শেষ করে এসেছি আগেই।

"তবুও বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। আমি শুয়েছিলাম। উঠতে চাইলাম, পারলাম না। আমার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে যেন ভার চেপে আছে কিসের, ধীরে ধীরে আমার সমস্ত স্নায়ু ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগল। বুজে এল চোখ। এ চোখে এখনো ঘুম আছে।

"না, ঘুম নয়। ঘুমের ছদ্মবেশ ধরে এসেছে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। টুকরো টুকরো, ছাড়া ছাড়া, সম্পর্কহীন কতকগুলি ছবি। একবার দেখলাম, আমি আর সুপ্রীতি শুয়ে পালঙ্কে। চারদিকে প্রচুর ঐশ্বর্য সম্ভার। আমরা দুজনে ভাসছি এক প্রসন্নময় আনন্দের স্রোতে। হঠাৎ সুপ্রীতি বিকট চীৎকার করে রাক্ষুসীর মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ল আমার উপর। চোখে তার রক্তের নেশা।·····তারপর দেখলাম ভয়ঙ্কর কালো বিশালকায় এক লোমশ পুরুষের বুকে লেপ্টে রয়েছে সুপ্রীতি। আর খিল্‌খিল্‌ করে হাসছে আমার দিকে চেয়ে। হাসছে কিন্তু চোখে তার জল। বলছে আমাকে, এই পুরুষই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেমিক। আমার জীবন যৌবন, আমার দেহ মন যার পায়ে রেখে আমি নিশ্চিন্ত। যার বুকের আগুনে সমস্ত মিথ্যে, পাপ, পঙ্কিলতা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ সংসারের চোখে যে সবচেয়ে কুৎসিত, ভয়ঙ্কর, আমি তারই পায়ে সঁপেছি নিজেকে। আমার এই প্রেমিকের কাছে তুমি তুচ্ছ, হীন, বিকলাঙ্গ। দেখ, ভাল করে দেখ আমার এই দেবতাকে, আমার পরম প্রেমিককে, আমাব সর্বদুঃখহরকে।

"বলছে আর হাসছে খিল্‌খিল্‌ করে। আমি চীৎকার করছি, ও কে? ও কে! ও কে? জবাবে শুধু সেই হাসি।······আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগেও সেই হাসির শব্দই বাজতে লাগল আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে। গল্‌গল্‌ করে ঘাম ঝরছে আমার সর্বাঙ্গে।

"তারপর হাসির শব্দ একটু থামতেই, চারদিকে তাকালাম। তাকিয়ে চমকে উঠে বললাম। চিনতে পারলাম সেই ঘর। দেখলাম, বাতি নেভানো। ঘরে আলো এসে পড়েছে উত্তরদিকের জানালা দিয়ে। ফিরে দেখি, হরিদাসের শয্যা শূন্য। ঘরের দরজার আগল খোলা, ভেজানো।

হরিদাস নেই।

"ভয়ে উঠে দাঁড়. য তাড়াতাড়ি। আমি একা। এখনো আমার ঘাড় বেয়ে ঘাম ঝরছে। সারাটি রাত্রিই হাসি শুনেছি আর ঘেমেছি। আর সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ!

"আচমকা ভেজানো দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত হ'ল। ফাঁকে তার দুটি বিশাল আরক্ত

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। তারপর চোখ সরে গেল,

কিন্তু অশরীরীর ধাকায় যেন দরজাটি খুলে গেল একেবারে। আবার ফিসফিস। উঠোনে পায়রার ভিড়।

"ঘরে ঢুকল নীলু, নীলকান্ত গোমস্তা। বলল, আপনার খুড়োমশাই কর্তার সঙ্গে বার-বাড়িতে গেছেন। সেখানে লোকজন ঠাকুর পুরুতেরা এসেছেন। আপনি হাত মুখ ধোন।

"সমস্ত কিছুই হতে লাগল একটি লাইন ধরে। হাত ধোয়া, জলযোগ, বাইরের ঘরে যাওয়া তারপর আশীর্বাদ। আমার অনামিকায় উঠল একটি দামী পাথর দেওয়া সোনার আংটি। দশজনকে প্রণাম করে, একাদশ ব্যক্তি হরিদাসের কাছে গিয়ে আমার হাত পা শক্ত হয়ে উঠল। শক্ত হলেও উপায় নেই। হরিদাসের পায়ে আমাকে হাত দিতে হ'ল। হরিদাস বুকে চেপে বলল, সুমতি হোক। গলা নামিয়ে বলল, কলকাতা যাচ্ছি, বিকেলে আসব। সাবধানে থাকবি।

"অবাক হয়ে হরিদাসের মুখের দিকে তাকালাম। হরিদাস সরে গেল দূরে। বুঝলাম ইতিমধ্যে অনেক কথা হয়ে গেছে, ঘটনার গতি পরিবর্তিত হয়েছে। তারপর সর্বসমক্ষেই হরিদাস বলল মাধববাবুকে, তা হলে আমি আর দেরি করব না বাঁড়ুজ্জেমশাই। নীলকান্তবাবুকে নিয়ে আমি কলকাতায় চলে যাই।

"মাধববাবু বললেন, নিখিলের খুড়িমাকে কিন্তু আনা চাই যোগেনবাবু!

"হরিদাস : শরীর সুস্থ থাকলে, নিশ্চয়ই নিয়ে আসব। তারও তো সাধ কম নেই। এখন না হলেও অদূর ভবিষ্যতে বাঁড়ুজ্জেমশায়ের অন্দরমহলে তো তাকে আসতেই হবে একদিন।

"হাসির পালা শেষ করে সবাই বিদায় হ'ল। আমি আবার ভেতরবাড়িতে বন্দী হলাম। নীলকান্তকে নিয়ে হরিদাসের কলকাতা যাওয়া আমার বুকে ভয়ের কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল। যদি সত্যই বীণাদি আসেন! খুড়িমা কেন, মা বলতেও আপত্তি নেই। কিন্তু এ মুখ দেখাব কেমন করে। হরিদাসের অসাধ্য কাজ তো কিছুই নেই। যদি সে নিয়ে আসে বীণাদিকে। কলকাতা যাওয়ার আগে হরিদাসের সঙ্গে আর একবার দেখা হ'ল। কাছাকাছি ছিল না কেউ! আমাকে কিছু বলতে হ'ল না। হরিদাস নিজেই তার জলদীপ্ত শাণিত চাপা গলায় বলল, কালিঘাটের মা কালী বোধহয় সঙ্গে এসেছে

আমাদের। আর ভয় নেই। এখন যত তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করা যায়, ততই ভাল। দেখছি, বাগড়া দেওয়ার লোকের অভাব নেই।

"আমি যতই হরিদাসের কথা শুনি, ততই নতুন নতুন ভয়ের কথা আমার মনে হতে থাকে। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি হরিদাস। আবার কি করতে যাচ্ছ তুমি?

"হরিদাস : যা সব খুড়োরাই করেন, তা-ই করতে যাচ্ছি। শুভস্য শীঘ্রম্‌। এ ফাল্গুনের মধ্যে বিয়ের দিন আছে একমাত্র পরশু। তারপরে খরা মাস চৈত্র। শুভকাজ নাস্তি। সারা বছরের আবর্জনা মুক্ত করার মাস।

বলে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল হরিদাস। আর আমার চোখের চার পাশে ঘিরে এল একটি অদৃশ্য জাল। পরশু, পরশু! আমার সব লীলা সাঙ্গ হওয়ার দিন আসছে। বললাম, এরকম কথা তো ছিল না হরিদাস, এত তাড়াতাড়ি—

"হরিদাস তার নিজের মতো করে বলল, ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, তা হলে এমনি হয় নিখিলেশ।

"বুঝলাম সহজভাবে কথা বলার সময় শেষ হয়েছে। বললাম, হরিদাস, আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতা যাব। ঘুরে আসব।

"হরিদাস এক মুহূর্ত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, তা হয় না নিখিল। বলেছি তো আর ঘোমটা টানার চেষ্টা করে কিছু হবে না। আমি যাচ্ছি, আসব কাল রাত্রে। ইতিমধ্যে তোর যদি কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে, তবে তোর সঙ্গে লোক দিয়ে দিতে বলেছি আমি মাধববাবুকে।

বলে তার নিঃশব্দ হাসির ছুরিকাঘাত করে গেল আমার জিভে। যেখানে কথা ছটফট করছিল বেরুবার জন্য।

"হরিদাস চলে গেল। আমি ভূতগ্রস্থ আত্মার মত ছটফট করে মরতে লাগলাম। একি হল! ভেবেছিলাম, আর একবার, এই ব্যূহের মধ্যে একটুখানি ফাঁক পাব বেরুবার। হয় তো সব শেষের জন্যে পারব প্রস্তুত হতে, নয় তো পাব পালাবার পথ।

"কিন্তু পরশু, পরশু! হঠাৎ চমকে হাতের দিকে তাকালাম। বিদ্রূপ করে হাসছে মিটমিটিয়ে অনামিকার আংটির পাথরটি। যেন এক চোখো কাণাটার মতো আমাকে রেখেছে চোখে চোখে।

"আর দুটি চোখে চোখে রাখল আমাকে কুসুম। কেবল উঁকি ঝুঁকি উঁকি। অর্ধেক গাঁটছড়া তো বাঁধাই হয়েছে। দেরী শুধু সাতপাকে। তাই, সইয়ের ঘরের কাছাকাছি আসার ছলনা। আমার পক্ষ থেকে একটু ডাকের ইশারা থাকলে সহজ হয়ে যায় সব কিছু।

"দুপুরে খাওয়ার পরে, ঘরে ঢুকে বসতেই আমার ভেজানো দরজা গেল খুলে। সামনে তাকিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ালাম! কে? যেন চেনা চেনা মুখ। না, মুখ নয়, ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু যে আমার অনেকদিনের চেনা। খুশির পরে একটু ব্যথা বৈরাগ্যের ছাপ।

"পরমুহূর্তেই চোখ পড়ল তার চোখের দিকে। ঝকঝকে নীল নিষ্পলক আয়ত চোখ। তাকিয়ে আছে আমার মাথার ওপর দিয়ে, দেওয়ালের দিকে। দোহারা শ্যামাঙ্গিনী। তীব্র অনুভূতিতে টান টান মুখ। এলানো চুলের রাশি। হাতে পানের বাটা।

"তখনো বুকটা ধ্বকধ্বক করছে। সেই মূর্তির পেছন থেকে উঁকি দিয়ে কুসুম বলল, আমার সই, মালতী। জানেন তো আশীর্বাদের পর আর দেখাদেখি করতে নেই। লুকিয়ে নিয়ে এসেছি। আপনাকে পান দিতে এসেছে।

"বলে সে মালতীকে ঠেলে নিয়ে এল আমার কাছে। বলল, দে।

"এতক্ষণে সেই ভয়ঙ্কর নীল চোখে একবার পলক পড়ল। তারপর একটি পান বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে, ঠিক চক্ষুষ্মানের মতোই।

"কোনরকমে হাত বাড়িয়ে পানটি নিলাম। তবু দাঁড়িয়ে রইল দুজনেই। আমিও দাঁড়িয়ে। কুসুম হেসে বলল, বসুন।

"আমি বসলাম। কিন্তু চোখ তুলতে পারছিনে। কুসুম নিঃশব্দে হেসে উঠে বলল, দেখুন।

"কুসুমের দিকে তাকালাম। কুসুম বলল, এদিকে নয়, ওদিকে।

"অলঙ্ঘনীয় নির্দেশের মত তাকালাম। সেই মুখে লজ্জা ও বিষণ্ণতা। কাঁপছে শুধু উজ্জ্বল দুই চোখের মণিহীন বোবা নীলনভ। কাঁপছে ভ্রূ'র মাঝখানে ত্রিনয়ন তুল্য রক্তাভ টিপ।

কুসুম: কেমন?

আমি : ভাল।

: শুধু ভাল ?

"কুসুম যেন সুপ্রীতি। গলায় কি তার বিদ্রূপের আভাস? যেন বিস্ময়ে হেসে আমাকে দেখছে আর মনে মনে বলছে, দেখ, ভাল করে দেখ। ফাঁকি দিতে পারোনি। ছুটে এসেছি কলকাতা থেকে তোমার পিছনে পিছনে, সামনে দাঁড়িয়ে দেখাব বলে। আবার বললাম সভয়ে, ভাল।

কুসুম হেসে উঠল নিঃশব্দে অথচ এক অদ্ভুত শব্দ করে, আমার বুকের হাড় কাঁপিয়ে। হেসে চলে গেল মালতীকে নিয়ে।

"এক ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতায় কাটল সারাটি দিন। হঠাৎ বিকালের দিকে একসময় চারদিক বড় নিঝুম মনে হল। মনে হল, এখানে লোকজন কেউ নেই। আমার দুই পা আপনি ঘর ছেড়ে এল বাইরে। কেউ নেই। বুকের মধ্যে ঝন্ ঝন্ করে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে আমার পা দুটি নিশি পাওয়ার মত পেরিয়ে গেল উঠান। দেখলাম বাইরে যাওয়ার দরজা খোলা। তারপর বারবাড়ি। কেউ নেই, নিঃশব্দ। বুকের ঝন্ ঝন্ আরো তীব্র হল। তারপর বারবাড়ির উঠান। সেখানে একদল পায়রা চকিত চোখে তাকাল আমার দিকে। যেন সন্ত্রস্ত চোখে জিজ্ঞেস করছে, কোথায় যাচ্ছ? কোথায়? আমার দুই পায়ে অদ্ভুত দ্রুতগতি। বারবাড়ির উঠান পেরিয়ে বড় দেউড়ি। বুকের শব্দ ফেটে পড়বে যেন। দেউড়ি পেরিয়ে বাইরে। এ বাড়ির সীমানার বাইরে এসেছি। সন্ধ্যার ঘোর লাগছে। ছুটতে চাইছে পা দুটো।

"পেছনে পায়ের শব্দ পেলাম। সে শব্দ আমারই হৃৎপিণ্ডের শব্দ কিনা, কে জানে। ফিরেও তাকালাম না।

"কিন্তু সে শব্দ আরো দ্রুত, ছুটন্ত মনে হচ্ছে। পরমুহূর্তেই আমার সামনে আলো দেখতে পেলাম! দেখলাম, আমার সামনে, 'আমারই সঙ্গে চলেছে একজন। এক হাতে জ্বলন্ত হ্যারিকেন, আর হাতে লাঠি, কালো কুচকুচে একজন চাষী পুরুষ। একগাল হেসে বলল, পিসিমা পাঠিয়ে দিলেন। একলা একলা চলেছেন, তাই।...না না না উদিকে নয়, ইদিকে চলেন। গাংটাংক্ রোডে, ওই মাঠের ধারে বেড়াতে যাবেন তো? এই উতোরের রাস্তায় চলেন,

এসে পড়েছি।...মাঠের ধারেই, ন' শালিকের বিল দেখেছেন বাবু? সেও বেশ বেড়াবার জায়গা কিন্তুন।

"অসহ্য যন্ত্রণায় যেন আমার দ্রুতগতি পা এক অদ্ভুত শব্দ করে শ্লথ হয়ে এল। অকম্পিত স্বাভাবিক গলায় বললাম, আমার কি দরকার। আমি নিজেই পারব। লোকটা হেসে বিগলিত হয়ে বললে, তা বললে কি হয় বাবু? কলকেতার মানুষ আপনি। এ সব জায়গায় যে বড় ঠ্যাঙাড়ের ভয়। সেইজন্যই, ওই যে পেছনে পেছনে গোমস্তামশায়ও আসছেন।

"গোমস্তা! পেছন ফিরে দেখলাম গোমস্তা হরেন। দেখতে দেখতে আমার পা থেমে গেল। আর কোন উপায়ই নেই যদিও বা পারতাম, পরিণতির কথা চিন্তা করে সাহস হল না।

"লোকটা বলল, সঙ্গে আছি বাবু, ভয় কি! চলেন, এট্টু ঘুরে আসবেন।

"হরেনও হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, হ্যাঁ, চলেন না, একটু ঘুরেই আসবেন।

"বললাম, না থাক! আর যাব না। বসে বসে ভাল লাগছিল না। তা-ই বেরিয়েছিলাম।

"যে পথে যাওয়া, আবার সেই পথেই ফেরা। চারদিকে বেড়া।

"তারপর এক দুঃসহ অবস্থায় সময় কেটে গেল। হরিদাস আশ্চর্যরকমভাবে সবদিক বজায় রেখে ফিরে এসেছে কলকাতা থেকে। সন্ধ্যাবেলা আশীর্বাদ করেছে মালতীকে। বীণাদিকে আনার অসম্ভাব্য পরিকল্পনা বাতিল হয়েছে।

"আমার আস্তানা হ'ল, এ বাড়ির দক্ষিণে, মাধববাবুর নতুন বাড়িতে। সেখান থেকে আগের বাড়িতে এসে হ'ল বিয়ে। সম্প্রদানের সময় মাধববাবুর চোখে দেখলাম জল। গলার স্বর ভাঙা। শুভদৃষ্টির সময় আবার সেই নীল নিষ্পলক চোখ। সেই চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। কিন্তু সেই চোখ দেখে আমার বুকের মধ্যে শিউরে উঠল। ওই চোখ দৃষ্টিহীন বটে, কিন্তু মনে হল যেন আমার বুকের শেষ অবধি দেখছে চিরে চিরে।

"দেখলাম প্রাণের সই কুসুমের চোখেও জল।

"শুধু মাধববাবুর গলা শুনতে পেলাম, তোমাদের এক জোড়া চোখ যেন দু'জোড়া হয়।

"বাসররাত্রি গেছে। কালরাত্রি এসেছে।

"আর কি লিখব। তুমি হয়তো ঘৃণায় আমার লিখিত সব কাগজ এবার ছিঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু আমি দোষখালনের জন্য লিখতে বসিনি, ক্ষমা প্রার্থনার জন্যেও নয়। যে দহনের অগ্নিকণা আজও নেভেনি, যে আগুন জ্বালিয়েছিলাম, কিন্তু এতদিন ঘেঁটে দেখতে সাহস হয়নি আরো উসকে ওঠার ভয়ে, আজ সেই সাহসটুকু নিয়ে বসেছি লিখতে।

"আজকের এই কালরাত্রিতে সবে আগুন জ্বালানো হ'ল। তার লেলিহান শিখার বিস্তৃতিটুকু না বললে যে শেষ হয়না।

"আজ ভাবছি, যে দরিদ্র যুবকেরা, আমার সেই সব গরীব বন্ধুরা, যারা গোঁড়া অভিভাবকদের মতের বিরুদ্ধে ভালোবেসে বিয়ে করেছে, নিজের ও দশের সুখে দুঃখে সামাজিক জীবন যাপন করছে, আমার প্রকৃত বিশ্বাসঘাতকতা তাদেরই বিরুদ্ধে করা হয়েছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে, আমি তাদের কাছে সব চেয়ে বড় ব্ল্যাক স্পট। যদিও আজকের জীবন-বেগের কাছে আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

"এ দেশের সমাজে এখনো বর্ণবিন্যাসে চলিত। বামুন-কায়েত-বদ্যি'র রংএ তার পরিচয়। এ শতাব্দীর গোটা সমাজের কাঠামোটাকে এক-চোখা কাণারা, ওদের সামন্ততান্ত্রিক ঘরের পাপ আর নোংরামি ঢেকে, এখনো টুকরো টুকরো করে রাখতে চায়। কী বিচিত্র আত্মাভিমান। ওরা অফিসে বাগ্দী বড়বাবুর পায়ে তেল মাখে, বন্ধুকে ঠকিয়ে চেয়ার টপকাতে চায়ে, পাড়ায় আর ঘরে এসে বর্ণ সামাজিকতা করে।

"করুক, আমি বর্ণ সমাজের কথা বলছিনে। আমি বলছি দেশের সৎ মানুষের বৃহত্তর সমাজের কথা। সেই বৃহত্তর সমাজের থাক থেকে গড়িয়ে পড়েছি আমি। তার জন্যে সমাজের সারিতে যারা প্রথম নাড়া খাবে, সে আমার সৎ বন্ধুরা।

"পাপের প্রথম ধাপ পার হওয়া গেছে। এবার তার ক্রিয়া শুরু হ'ল। প্রকৃত বিভীষিকার দরজা তো খুলল এবারই।

"আজ শুভরাত্রি।

"বাসররাত্রি, কালরাত্রি, তারপরে আজ শুভরাত্রি। দক্ষিণের সেই নতুন বাড়িতে। অসংখ্য অচেনা মেয়ে পুরুষের কৌতূহলিত চোখের ভিড়ে দিবানিশি ঘুরেছি জবাইয়ের ভয়ে শঙ্কিত মুরগীর মত। কখন কোন্ চোখে পড়ব আর সেই মুহূর্তে ছুরি বসবে গলায়। সেই ভিড় কেটেছে। এখন খাওয়া দাওয়ার পাট চুকেছে। আমি ফুলশয্যার ঘরে! শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে ফুলের গন্ধে। ফুলের গন্ধেও যে এমন করে শ্বাসরুদ্ধ হয়, জানতাম না। উত্তর কলকাতার গন্ধ কেমন। উত্তর কলকাতার গাড়ির, রাস্তার, মানুষের, সমস্তকিছুর গন্ধটুকু কল্পনায় অনুভব করার জন্য বারবার শ্বাস টানতে লাগলাম। আর বারবার গোলাপ কুন্দ যুঁই চামেলীর সর্বনাশী গন্ধ আমার টুঁটি টিপে ধরতে লাগল।

"আর একদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে কেনা সামান্য রজনীগন্ধার গুচ্ছ, আমার আর একটি রাত্রিকে কত মহিমময় করে তুলেছিল। কী এক অজানা অনাস্বাদিত কৌতুক, রহস্য আর আনন্দের গন্ধ বয়ে নিয়ে এসেছিল সেই ফুলের গুচ্ছ। সেই রাত্রি আর এই রাত্রি। এই নিটোল শয্যার ফুলের কাঁটা, এ ঘরের অচেনা ভয় ধরানো ঐশ্বর্য, আসবাবপত্র, সমস্ত কিছুর মধ্যে পাপ বেড়াচ্ছে পা টিপে টিপে। আর চারদিকে যেন প্রেতিনী গলায় কারা হাসছে খিলখিল করে।

"হঠাৎ হরিদাস দেখা দিল। বলল, শুতে যাচ্ছি নিখিল, কাল সকালে দেখা হবে। বলে সে অতি ভয়াবহ একটি ইঙ্গিত করে গেল!

"তারপরেই কুসুম ঝড়ের বেগে মালতীকে এনে আমার বুকের উপর ফেলে দিল। কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার সারা গায়ে এখন চমকাবারও উপায় নেই। তবু খানিকটা সরে দাঁড়ালাম। কুসুম বলল, নিন মশাই, অনেক দেরি হয়েছে।

বলে হাসতে হাসতে ঘরের বাইরে গেল চলে। এ ঘরের বাইরে তাদের আসল আসর বসেছে। সেখানে ঢলাঢলি, কানাকানি, গায়ে পড়াপড়ি চলছে। কিন্তু আমার হাত পা শিথিল হয়ে এসেছে। ভয়ে দরজাও বন্ধ করতে পারছিনে।

"আবার ঢুকল কুসুম। চোখ পাকিয়ে বলল, নিন, খুব হয়েছে! দরজায় খিল দিন। পারেন তো পুবদিকের জানালাটা না হয় একটু খুলে দেবেন!

আবার একটা হাসির শিরশিরিণী হিলহিল করে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। সব বন্ধ, দরজা জানালা, সব। এইবার তুলতে হবে চোখ, তুলতে হবে। তবু এতক্ষণে স্বাধীনভাবে দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম। এ ঘরের দ্বিতীয় প্রাণী, আর যাই হোক দেখতে পায়না।

"এতক্ষণ পরে, আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাসের পালা শুরু, হবে কিনা জানিনে। আমি চোখ তুললাম। মিথ্যে বলবনা, তখনো মালতীর আর কিছু চোখে না পড়ে থাক, দেহটি পরিপূর্ণ চোখে পড়ল। ঐশ্বর্য ও ভোগে লালিতা বলে কিনা জানিনে, কিংবা দৃষ্টিহীনা বলে প্রকৃতিরই এ অবদান। মালতীর দেহের প্রতিটি অঙ্গ, আলাদা আলাদা ভাবে চোখে পড়ে।

"আমি তাকে দেখছি দূর থেকে। মুখ তার দৃষ্টিহীন মানুষের মত কিঞ্চিৎ স্থূল, কিন্তু করুণ। তার শরীরের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে, ওঠানামায়, উদ্ধত বলিষ্ঠতা। অথচ যৌবনের সেই বলিষ্ঠ ঔদ্ধত্যের কেমন একটি করুণ আবেগ ঘিরে আছে তাকে। আর তার অসহ্য নীল দুটি চোখের মণি। সর্বাঙ্গ ভরা সোনায়।

"আমি দেখছি, কিন্তু রক্তধারা স্তব্ধ। আমি যেন মার খাওয়া জানোয়ারের মতো কোণ খুঁজছি। মার খাওয়া নয়, পোষা। কোন এককালে একজনের মুখে শুনেছিলাম, বিবেক বস্তুটি নাকি দুর্বল কাপুরুষের ছলনার হাতিয়ার। আজ মনে হচ্ছে ওটি পোষমানা জীবের ভয়েরই নামান্তর। আমার দুর্বল মনের বিবেক মালতীর দিকে তাকাতেও ভয় পাচ্ছিল। ভয় হচ্ছিল এই ভেবে, চোখের ওই নীল পাথর দুটি হয়তো এখুনি কালো কুচকুচে হয়ে উঠবে। আর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বিচিত্র হেসে বলবে, বেশ। তেমনি করে একজনই হাসতে পারে। একজন আর সেই একজন, এখন হয়তো অসুখের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কিংবা, এই ফুলশয্যা ঘরের ছদ্মবেশী বরটির ভাবনায় দুশ্চিন্তা করেছে তন্দ্রার ঘোরে। তার পাশে ছোট ছেলে, বাপ যার লাখপতি মাধব বাঁড়ুজ্জের ঘরজামাই হয়েছে দুদিন আগে।

"ভাবতেই আমার সারা মুখ কুঁকড়ে উঠল। আয়না নেই কাছে, মুখ দেখতে পাচ্ছিনে নিজের। নইলে নিজের মুখ দেখে হয় তো নিজেই শিউরে উঠতাম। আমার বুক, আমার আকণ্ঠ ভরে উঠেছে ঘৃণায়। কাপুরুষের ঘৃণা। হবেইতো।

আমি যে কোনদিক পুরো ভাঙতে পারিনে, গড়তেও পারিনে। জীবনের দুটি রাস্তা আছে। একটি ঘরের, আর একটি ঘাটের। কথায় বলে, না ঘর-কা, না ঘাট-কা আমি তা-ই।

"আমি ঘরের কথা ভুলতে পারিনি। ঘাটের পথে এসে মন কাঁদছে ঘরের জন্য। সেই কান্নার মধ্যে, সমস্ত মনটা ঘৃণায় ভরে উঠল সামনের এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে, যাকে এখন সকলেরই করুণা করতে ইচ্ছে করছে। জানি তোমারো করছে।

"আমার পকেট ভরতি এখন টাকা। এই টাকাগুলি নীলু গোমস্তার হাত দিয়ে বিয়ের দিন পাঠিয়েছিলেন মাধববাবুই। নীলু এসে বলেছিল, আপনার কাকা দিয়েছেন, কাছে রাখুন, দরকার হতে পারে। বেশ কিছু টাকা, দুতিনশো। যে জন্যে সব করেছি, সেই তেল আমার পকেটে। কিন্তু আমার সমস্ত মেসিন পড়ে আছে অন্যত্র।

"মালতী পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। কিন্তু মাটির পুতুল তো নয়, আমারই মত দম দেওয়া। আমারই মতো ওর হৃৎপিণ্ড, হয়তো আমার চেয়ে বেশি জোরেই ধ্বকধ্বক করছে। নিশ্চয়ই ভাবছে ওর চোখের এই অন্ধকার নিঃশব্দ ফুলশয্যার কথা। ফুলশয্যা তো নয়, যেন নির্বিকল্প সমাধি ঘটেছে সমস্ত জীবের। অনেকক্ষণ যে হয়ে গেল।

"তবু এখনো বাইরে ফিস ফস, হিসহিস, কাছে আর দূরে দুপদাপ, রিনিঠিনি। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসে চমকে তাকালাম। মালতীর দীর্ঘশ্বাস। পুতুল জাগছে। কী বলি। কিছু বলা দরকার। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আপনি বসুন না।

"তরল আগুনের মত শাড়িটা ঢেউ দিয়ে উঠল। ধীর কিন্তু ভীত চমকিত একটি গলা শোনা গেল, আমাকে বলছেন?

"আর কাকে বলব! চুলগুলি টেনে ধরলাম। তবু কণ্ঠস্বর অবিকৃত রেখে বললাম, হ্যাঁ।

"একমুহূর্ত নীরব। চোখের নীল পাথর দুটি একটু ভিজে উঠল বোধহয়। আবার সেই ধীর করুণ এক গ্রাম্য মেয়ের গলা শোনা গেল, আমাকে 'আপনি' কেন? শুনলে পাপ হয় যে?

"আপনি বলাতে, এ সেই সফিস্টিকেটেড সমাজের মেয়ের আপাত তৃপ্তি নয়, সাধারণ শিক্ষিতা মেয়ের লজ্জাও নয়, গাঁয়ের মেয়ের সংস্কার ও ভয়।

"তাড়াতাড়ি বললাম, ও! আচ্ছা, তু···তুমি বস।

"আবার একটি দীর্ঘশ্বাস আর শাড়ির খসখসানিতে সারা ঘরটার মধ্যে একটা রুদ্ধ বাতাস যেন পাক খেতে লাগল। মালতী বলল, খাটটা কোথায়?

"মাধব বাঁড়ুজ্জের মেয়ে, তার হাতের কাছে কেউ না থাক, স্বয়ং মাধববাবু থাকতেন। চোখ না থাক, চাইবার আগে হাতের কাছে যার লোকে জুগিয়ে দেয় জিনিস। আমার গত জীবনের শোনা কথা 'হিউম্যান বোধের' খাতিরেও খাটে বসিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একপাও অগ্রসর হতে পারলাম না। বললাম, তোমার ডানদিকে।

"হাত বাড়িয়ে খাট স্পর্শ করে মালতী হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বসল না। বোধহয় আমার আগে বসতেও পারবে না।

"আবার নতুন ভয় ঘিরে আসতে লাগল আমার মনে। দম খাওয়া পুতুল নড়ে চড়ে উঠেছে। এইবার কিছু বলা দরকার। কিছু বলা দরকার, কিন্তু কী বলি। শুধু দেখলাম, অন্ধ মানুষের মুখে এক বিচিত্র বিস্ময় ও ব্যথার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে।

"আমি বুঝি, তবু জানতাম না যে মালতী মাত্র আঠারো উনিশ বছরের এক দৃষ্টিহীনা কিন্তু তরুণী। বান্ধবী তার কুসুম। জীবনের এক অনাগত অধ্যায় নিয়ে যে তাকে দেখিয়েছে অনেক স্বপ্ন। কুসুমের চোখে মালতী দেখেছে নিজেকে, নিজের নারীরূপকে আর তার অষ্টাদশী বুকের শিরা উপশিরা এক বিচিত্র আনন্দে ও ব্যথার উঠেছে টন্‌টন্ করে। তার নিরালা অন্ধকোণে বসে, ঘুঘু ডাকা দুপুরে, কত স্বপ্ন দিয়ে রচেছিল সে এই রাত্রিকে।

"আর আজ, ফুল ও সেন্টের গন্ধে ঠাসা ঘরটিতে সেই রাত্রি যখন এল জীবনে। যখন এক অজানা ভয়ে ও আনন্দে সমস্ত স্নায়ু কাঁপছে, তখন অন্তদিকে নরকের নৈঃশব্দ। যখন বিচিত্র এক হাতের স্পর্শের ভয়ে ও আনন্দে, তার উনিশ বছর এসে ঠেকেছে একটি বিন্দুতে, তখন মনে হচ্ছে, সমস্ত বিশ্ব এক নিরাকার অন্তহীন অন্ধকার।

"এসব ভাবতেই আমি আরো ছটফটিয়ে উঠলাম। হয় তো এবার ওই দৃষ্টিহীন চোখে সন্দেহ ঘনিয়ে আসবে। গন্ধ পাবে পাপের। এই অগ্নিপরীক্ষার কথা তো ভাবিনি! কী বলব।

"হঠাৎ মনে হ'ল, ভূতের থাপ্পর খেয়েছি মালতীর কথায়। চকিতে সোজা হয়ে উঠলাম। মালতীর গাল বেয়ে জল পড়ছে। সে মুখ তুলে বলল, আপনার কষ্ট হচ্ছে, না?

"ভীষণ ভয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, না তো! কষ্ট কেন হবে?

"মালতী শুধু আদরে লালিতা বলে নয়, অন্ধ বলেই হয়তো, অপরের মুখ দেখতে পায়না বলেই হয় তো, তার অনুভূতি যেমন গভীর প্রাণের কোন কথাও তেমনি আটকায়না। বলল, আমি যে অন্ধ।

বলতে বলতে তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না না।

"না না, কিন্তু তবে কী? কী বলব!

"মালতী আবার বলল, আপনি ক— তো লেখাপড়া শিখেছেন। ক—তো।

বুঝতে পারছি শত দুঃখেও নতুনের বাধা ভেঙে কথা বলতে তার লজ্জা কষ্ট ভয় সবই হচ্ছে। তবু বলল, আপনি কতো ভাল কতো বড়!

"আশ্চর্যরকমভাবে অসঙ্কোচ বেদনায় কথাগুলি বলছিল মালতী। শুধু বুঝিনি, শুধু বেদনা নয়, তার নারীত্বের অভিযোগও ছিল এই অসঙ্কোচ অভিব্যক্তিতে। সে যে অপমান বোধ করেছে এতক্ষণ। তার অন্ধ জীবন-যৌবন বাসরের এই ভৌতিক নির্বিকার নীরবতা তাকে সংশয়ান্বিত করেছে।

"মালতী তখনো বলছে, আপনার কত কষ্ট। কিন্তু আমি কি করব।

এবার সে আর গলা অবিকৃত রাখতে পারলাম না। কিন্তু আমি বিভ্রান্ত, বোবা হয়ে গেছি। মালতীর অসহায় চোখের নীল মণি দুটি কাঁপতে লাগল। তারপর মাথা নীচু করে রইল।

"এ উক্তির মধ্যে কোথাও অসরলতা ছিল না। তা বুঝতে পেরেছি বলেই তো আমি আমার অস্ত্র শাণাচ্ছি। আমি যে এখন দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছি। যা বলব, তা-ই দেববাক্য। তবু একেবারে যুক্তিহীন হলে চলবে না।

কিন্তু কিছুই যে মুখে আসছে না। এখন কি হরিদাস এসে কিছু শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারে না।

"সময় কাটছে পলে পলে। যে ভৌতিক নীরবতাকে মালতী তার চোখের-জলে ভেঙেছে, পায়ে পায়ে আবার ঘিরে আসছে সেই ভুতুড়ে নিঝুমতা। ফিরে ফিরে দেখি মালতীকে, আর ঘামতে থাকি দরদর ধারে। বুঝি, তার কর্ণেন্দ্রিয় আর হৃৎপিণ্ডের গতি হয়েছে একাত্ম। আমার শারীরিক দূরত্ব সে অনুভব করতে চাইছে দেহের প্রতি তন্ত্রী দিয়ে। শুঁকে অনুভব করতে চাইছে তার অদৃশ্য দেবতার মন।

"আমার এই পাপ মনের প্রেমের রীতিনীতিও বড় বিচিত্র। বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে। মালতীর এই স্বভাব রূপের মাঝে তার বাঁধভাঙা যৌবন নিশ্চিত অপাপবিদ্ধ অলিকুলের মধুকর হ'তে পারত, কিন্তু নিজেকে দিয়ে আমি সেটুকু ভাবতেও পারছিনে। মালতীর ওই পাতলা শাড়ির আবরণে বলিষ্ঠ বাঁকে রেখায়িত দেহের প্রতি অঙ্গে এক তীব্র অথচ শান্ত সৌন্দর্য তার অন্ধত্বের বেদনা নিয়ে কেমন যেন বিষণ্ণভাবে হাসছে। এ রূপের মায়া আছে, টান আছে, কিন্তু আমার পাপ মনের অন্তস্রোতে আর একজনের রূপের যে দ্যুতি রয়েছে ছড়িয়ে, তারই ছটায় আমার চোখ রয়েছে ধাঁধিয়ে। মালতীর এ রূপের জন্য আমার মনের গহনে কোন আলোড়ন নেই। মাত্র একজনেরই সর্বাঙ্গের প্রতিটি চেনা বাঁক আমার সুধাভাণ্ড রেখেছে টাবুটুবু ক'রে। বাকী সব ওপচানো বিষের ফেনা।

"এই মুহূর্তে যদি আমি মালতীর বিজ্ঞান সাধ মেটাতে পারতাম, তবে হয় তো নিষ্কৃতি পেতাম আমার এই সমূহ রুদ্ধ বাক্‌যন্ত্রণা থেকে। আর সুখী হত এই ব্যাকুল অন্ধ ভীত হৃদয়। কিন্তু পাপ করতে এসেও জলাঞ্জলি দিতে পারছিনে নিজের স্বার্থ। কি বলব! যার প্রতি স্নায়ু কাঁপছে থরোথরো, এক অনাস্বাদিত নিষ্পাপ স্পর্শে ফুলের মত ফুটবে ব'লে তাকে কি বলব! বলব, আমার আছে দুর্নীতি।

"তারপরে হঠাৎ খুঁজে পেলাম কথা। হেসো না যেন। তুমি হাসতে পারো, মালতীরা আমার কথায় হাসতে পারে না। কাছে এলাম। ভয় হচ্ছিল তবু,

ঠিক জায়গায় লাগবে কিনা। বললাম, তুমি অকারণ দুঃখ পাচ্ছো। তোমাকে একটি কথা বলব।

"বলুন।

"মালতীর বুক নিশ্চয় ভয়ে ও আশায় দুলছিল। বললাম, কিন্তু তুমি কাউকে বলো না সেকথা।

"বুঝলাম, মালতী ভয় পেয়েছে। তবু বলল, আপনি যদি [illegible] করেন, তবে বলব না।

"আমি জানতাম, এ প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ হবে না। [illegible], নিজের মুখের চেহারাটা কতখানি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কী ভাগ্যি, মেয়েটি [illegible]তে পায়নি। বললাম, লেখাপড়াটাকে বড় ভালবেসেছি। আমার একটি পরীক্ষার এখনো বছর খানেক বাকী আছে। ভেবেছিলাম, এ একবছর স্ত্রীকে স্পর্শ করব না। তা-ই—

"মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার চোখে যেন আগুনের ছ্যাকা লাগল। দেখলাম, তার জলভরা নীল চোখ দুটি চিকচিক করছে। ঠোঁটের কোণে কাঁপছে সলজ্জ অথচ প্রাণখোলা হাসি। চুপ ক'রে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কাঁপছে। তার ওই হাসি আমার মনকে আতঙ্কে দোলাতে লাগল। তারপর বলল, এ-ই কথা!

"আলোর দিকে মুখ তুলে বলল, আপনি পরীক্ষা দেবেন, এর চেয়ে বড় কথা আর কী আছে। আপনি কত লেখাপড়া শিখেছেন, আরো শিখবেন, সেজন্য আমাকে চিরদিন না ছুঁলেও যে [illegible]মি কিছু মনে করব না।

"আমি তীক্ষ্ণ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, সব জেনেও বুঝি মেয়েটা আমার সঙ্গে ছলনা করছে। সংশয় ও ভয় আমার ভিতর থেকে কথা বলল, চিরকাল নয়, একবছর।

"মালতী : তা হোক।

"তারপর একমুহূর্ত নীরব থেকে বলল, আমার একটি কথা রাখবেন?

তার এই সুস্পষ্ট করুণ কথা ও সলজ্জ হাসির মধ্যে আমি যেন বিদ্রূপের রহস্য অনুভব করছিলাম। বললাম, কী?

"মালতী : আমাকে একবারটি আপনাকে প্রণাম করতে দিন।

"সেই পুরনো উপন্যাসের পুরনো প্রেমের ব্যাপারগুলি যে আজো বাংলাদেশে এমন করে ঘটে, তা জানতাম না। তবু সে যখন প্রণাম করতে চাইল, তখন আর একটি প্রণামের কথা মনে পড়ে গেল আমার। আর একটি প্রণাম, আর একটি মুখ।

"কলকাতা তখন নিশুতি। সুপ্রীতির আর আমার সেই প্রথম রাত। সুপ্রীতি বলল, একটি কথা বলব? বল, হাসবে না?

"কী?

"হাসবে না তো!

"না।

"কিন্তু সে কিছুই বলেনি। ঢিপ করে একটি প্রণাম করেছিল সেই বিদুষী রাজেন্দ্রাণী।

"আমি বললাম, এটা কী হ'ল?

বলে দেখলাম, চোখে তার জল। বলল, কিছু না মানি তোমাকে তো মানি। বলে আমার বুকের কাছে আরো ঘন হয়ে বলল, বড্ড মার কথা মনে পড়ছে। দাদার ভয়ে মাকেও প্রণাম করতে যেতে পারলুম না।

"বুকের মধ্যে বড় টনটন করে উঠল। আমাদের অসীম আনন্দের মাঝে ওই ব্যথাটুকু কেমন এক রকম গাঢ় করে দিয়েছিল আমাদের দুটি হৃদয়কে। আর মা-বাপ আত্মীয় স্বজনের এত ব্যাকুলতা আর কোনদিন অনুভব করিনি। সেদিন কী আশ্চর্য কথাই না বলেছিলাম। বলেছিলাম, দুগ্‌গি, আমার মা-বাপহীন অনাত্মীয় জীবনের সব আত্মীয়কে পাবো তোমার মধ্যে। আমার পায়ে হাত দিয়ে মায়ের জন্যে দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কী? মা থাকার আনন্দটুকু থেকে বঞ্চিত না হই, সে মনটুকু থাকলেই অনেক পাব।

"আমার সেই পায়ে আজ আর এক প্রণামের পালা এসেছে। মালতীর প্রাণে একথা কোত্থেকে এসেছে, মাধববাবুর সেই অমায়িক করুণ চোখ দুটির কথা স্মরণ করলেই বুঝতে পারি। জীবনের সমস্ত খরবেগ ও উত্তেজনার ঊর্ধ্বে, মনকে নিষ্পাপ শান্তির মাঝে রেখে বেড়েছে মালতী। অন্তরে তার পরম নির্ভর ও ভক্তি হল মূলধন। কোনো জটিলতার চোরা পথে চলেনি সে। যা পাওয়া

গেছে, জীবনে সেটুকুই অনেকখানি জেনে সংসারকে ভালবেসেছে। কিন্তু আমার পায়ের নখে নখে বৃশ্চিক দংশনের জ্বলুনি। মালতীর ঠোঁটের হাসিটুকু ছলনাময়ীর হাসি। আমার ভয় তো যেন দূর হয় না। ঘৃণা ও ভয় উত্তরোত্তর বাড়ছেই।

"মালতী নাকের নিশ্বাসে আমার দূরত্ব অনুভব করতে চাইছে। এদিক ওদিক মুখ ফেরাচ্ছে। সে নতজানু হয়ে বসল। আমি দু'হাতে চোখ ঢেকে এসে দাঁড়ালাম, তার কাছে। আমার দেহের সমস্ত রক্ত গিয়ে নেমেছে পায়ে।

"মালতী কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল। আমি ঠোঁটে ঠোঁট টিপে আমার শক্তি বজায় রাখছিলাম। মালতী উঠে দাঁড়াতে দেখলাম আবার তার চোখে জল। বলল, আমি অন্ধ, সে দুঃখ আপনার চিরদিন থাকবে। আমার কোন দুঃখই নেই।

"হঠাৎ কোন কথা যোগাল না আমার মুখে। বুঝি, এ কথার পরে, সোহাগ না হোক, বন্ধু ভেবেও এই রাতে একটু সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। আমার ভাবে ও কথায়, কোথাও কিছু মাত্র পাওয়ার আবেগ নেই। আমি যে মালতীকে পেয়েছি, সে কথা না বললেও তার দৃষ্টিহীন জীবনে আমার সাহচর্যের আশ্বাসটুকু কেন পাবে না সে। তবুও আমার গলায় কোন আবেগ রসসঞ্চার করছে না। বললাম, না, আমার কোন দুঃখই নেই। বরং—বলতে বলতে জিভের রস টানতে হল। মালতীর জীবনে আমি কী দুঃখ টেনে আনব, সে ফিরিস্তি এ রাত্রে দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া, দুঃখ যে কারুর জন্য একলা আসেনি।

"মালতী যেন প্রাণ পেয়েছে কথা বলতে পেয়ে। সে ঠিক আমার দিকেই ফিরে, চক্ষুষ্মতীর মত লজ্জাবনত মুখে জিজ্ঞেস করল, বরং কী?

"দেখলাম, চোখের জল শুকোয়নি তার, তবু ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট অথচ সংশয়ান্বিত হাসির চমক। আমার যত বিতৃষ্ণা কথা বলতে তত ভয় অন্ধের এই আলাপ বিস্তারে। বিরূপ মন বলতে লাগল, মেয়েটার সবই বুঝি ছলনা। তবু বললাম, গলার বিদ্বেষ চেপে, বরং আমিই হয়তো বাড়ালাম তোমার দুঃখ।

"মালতী যেন বিস্মিত বেদনায় রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, না, না না, তা কখনো নয়। তারপরের কথা হয়তো লজ্জায় আটকে গেল তার।

"তারপর অনেকক্ষণ শাড়ির আঁচল খুঁটতে খুঁটতে কেমন একরকম সরল, লজ্জিত অদ্ধ হাসি হাসতে লাগল সে। হঠাৎ আবার জিজ্ঞেস করল মালতী, খুব কঠিন পরীক্ষা বুঝি ?

"চমকে উঠে বললাম, অ্যাঁ ? হ্যাঁ, খুবই কঠিন।

"রাত বেশি ছিল না। আমি শুলাম না বলে মালতীও শুতে পারল না।

"সকালবেলা দরজা খুলে বেরুতেই প্রথম দেখা কুসুম-বাহিনীর সঙ্গে। মুখ টিপে হেসে বলল কুসুম, আমার সই ভাল আছে তো ?

"আমার কাণে তখন ডাউন ট্রেনের চাকার শব্দ। হরিদাসকে খুঁজছিলাম। তবু একটু হাসতে হল। বলতে হল, হ্যাঁ।

"একটি চাকর ছিল সামনে। একটি ঘর দেখিয়ে বলল, খুড়ো মশায় ওই ঘরে আছেন।

"দরজাটি ভেজানো ছিল। ঢুকে দেখলাম, হরিদাস সিগারেট খাচ্ছে। অতি বিশ্রী হেসে বলল, কেমন হল ফুলশয্যে ?

"বোধহয় আমি তখন একটি সীমায় এসে পৌছেছিলাম। যেখান থেকে এগুতে একটি বড় ধাক্কার দরকার ছিল। যেখানে এসে প্রতিটি কথা ও শব্দ আমার রক্তধারাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। আমার সামনেই হরিদাস। একমুহূর্ত দাঁতে দাঁত চেপে আমার ক্ষিপ্ততার রাশ টেনে ধরলাম। কিন্তু হরিদাস আবার বলল, তা'হলে ভালই কেটেছে। হা—হা—সেই মুহূর্তে এই অতি কদর্য ইঙ্গিত সহ্য করতে না পেরে, আমি ঠাস করে তার গালে একটি চড় কষিয়ে দিলাম।— নোংরা কোথাকার! হরিদাস চমকে উঠে, গালে হাত দিয়ে, নিঃশব্দে ক্রূর বাঁকা ঠোঁটে হাসল। আর সেই মুহূর্তে দুরু দুরু করে উঠল আমার বুকের মধ্যে।

"হরিদাস বলল, এতেও ঘটনার কোনই হেরফের হল না নিখিল। আবার হাসল। আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, সুপ্রীতিকে আমার মনে আছে। কিন্তু আমার এ বউমাও ফেলনা নয়। বলতে বলতে আবার হাসল। বলল, ভাল। আমি একটু পরেই বিদেয় হব নিখিল। আমার পাওনাটা এবার বরপক্ষ থেকে মেটানো হোক।

"চমকালেও জানতাম, হরিদাস কিছু চাইবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি! ততক্ষণে আমার গলার স্বর দুর্বল হয়ে পড়েছে। বললাম, পাওনা মানে টাকা তো?

"হরিদাস : ভাল কথায় 'পারিশ্রমিক'।

"ততক্ষণে আমার গলার স্বর দুর্বল শুধু হয়নি, কৃপা ভিক্ষায় করুণ হয়ে উঠেছে। বললাম, হরিদাস, তুমি রাগ করেছ। সত্যি আমার—

"হরিদাস নিষ্ঠুর শ্লেষে হেসে ব'লে উঠল, ওসব বাজে কথা থাক। রাগ করিনি, অবাকও হইনি। ওটা বিজনেসের ব্যাপার।

"বললাম, কিন্তু এখনি তো টাকা নেই হরিদাস।

"তা জানি। কিন্তু যাবার আগে আমার তিন হাজার টাকার দরকার।

"সভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলাম, তিন হাজার? এখুনি? কোথায় পাব?

"হরিদাস হেসে বলল : সেটাও আমিই বলে দেব। আমি খুড়ো হয়ে কিছু চাইনি, তোকেও নগদ কিছু দেয়নি। যা দিয়েছে, সেটা বিয়ের খরচা, অতি নগণ্য। কিন্তু মাধব বাঁড়ুজ্জের অমন সুন্দর জামায়ের যদি তিন হাজার টাকা পিতৃঋণ থাকে, সেটা শোভা পায় না। বললেই হয়ে যাবে।

"অবাক হয়ে বললাম, পিতৃঋণ? আমার? আমি কি করে সেকথা বলব।

"হরিদাস হেসে উঠল, কি বলতে যাচ্ছিল। দরজায় করাঘাত পড়ল। মাধববাবুর গলা শোনা গেল, আসব?

"হরিদাস : আসুন, আসুন বাঁড়ুজ্জেমশাই।

"মাধববাবু ঢুকে হেসে বললেন, সকালবেলাই খুড়ো ভাইপোতে কী এত কথা হচ্ছে!

"হরিদাস অদ্ভুতভাব হেসে আমার দিকে চেয়ে বলল, কি রে, বলব?

"মাধববাবু বললেন, জিজ্ঞেস করার কি আছে, বলুননা। পর তো নই?

"হরিদাস : পরের কথাই যে নয়। একটু কেসে আবার বলল, নিখিলের বাবার, মানে আমার স্বর্গীয় দাদার কিছু ঋণ ছিল। কিছু মনে করবেন না মাধববাবু, আমি ওকে বলছিলুম, নিখিল, এবার দাদার ঋণটা তুই শোধ কর, তোর শ্বশুরমশাই তোর পিতৃতুল্য। আর এখন সে ঋণ থাকাটাও শোভা

পায়না। তা আপনার কাণে সেকথা তুলতেই ওর আপত্তি। বল্লে, নিজেই একটা কিছু করে বাবার দেনা শোধ করব।

"আমার বুকের মধ্যে শুকিয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, সমস্ত ঘরের মেঝেটা কাঁপছে। আমি টলছি।

"মাধববাবু মুগ্ধ চেখে তাকালেন আমার দিকে। হরিদাস আবার বলল, তবে দেখুন মশাই, আপনাকে শোনাবার জন্যে কিন্তু খুড়ো ভাইপোতে ওই সাত সকালে দেনার কথা বলছিলাম না। আমার তো কোম্পানির কলম পেষা হ'লেও যাবে না। নেহাৎ ভাইপোটিকে মনে করিয়ে দেয়া।

"মাধববাবু বললেন, ভাই যোগেনবাবু, আমার না থাকলে শুনেও আমি কিছু করতে পারতুম না। কিন্তু শুনে আমার লাভ হ'ল। নইলে আমি থাকতেও নিখিলকে দেনার ভার নিয়ে থাকতে হ'ত। আমি তো তাকে কিছুই দিইনি। না হয় ও টাকাটা আমি নিখিলকে যৌতুক স্বরূপই দেব। কিন্তু ঋণ কেন থাকবে।

"আমার দিকে ফিরে বললেন, তোমার খুড়ো মশায় ঠিক কথাই বলেছেন বাবা। আমি থাকতে তোমার এ ঋণ শোধ না হলে, মেয়েটার কাছে যে আমার মুখ থাকবে না। তোমার ঋণ যে এখন আমারই ঋণ।

"কৃতজ্ঞ হ'য়ে আমার কিছু বলা উচিত। কিন্তু আমার গলার এলো না একটি কথাও। কেবল বুকের মধ্যে অদৃশ্যে আঁচড়াতে লাগল কোন পশুর শাণিত নখর। আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে, আমাকে হাত মুখ ধোয়ার তাড়া দিয়ে মাধববাবু বেরিয়ে গেলেন।

"হরিদাস চাপা উল্লাসে হেসে বলল, আমি কি আজ সুপ্রীতির সঙ্গে দেখা করব ?

"আমি বজ্রাহতের মত বলে উঠলাম, তুমি ?

"হরিদাস : হ্যাঁ, কিছু টাকা কড়ি ওকে—

"আমি ভয়ার্ত স্বরে বললাম, না, না, তোমাকে যেতে হবে না। আমি যাব।

"হরিদাস : আজ ? আজ যেন যাস্‌নে। মনে রাখিস, শনিবারের বিকেল ছাড়া কলকাতায় যাস্‌নে। রবিবার ছাড়া থাকিসনে। আর মাসকাবার না

হতে কলকাতায় টাকা দিসনে। সেখানে তুই মাধব বাঁড়ুজ্জের জামাই নোস, আর আমার বাড়ির ঠিকানাটা জেনে রাখ!

"বললাম, জানি। কিন্তু কেন?

"তোর কাকার বাড়ি ওটা। যদি এরা কেউ সঙ্গে যায় তোমা?

"কিন্তু সেখানে তো বীণাদি আছেন!

"হরিদাস অদ্ভুত হেসে বলল, সে ভাবনা তো আমার।

"দুপুরের খাওয়ার পর হরিদাস চলে গেল। যাওয়ার আগে পিতৃঋণের সেই টাকাটা নিয়ে গেল সে। চোখে তার বিজয়ী জুয়াড়ীর উল্লাস। এবার অনেক বড় জুয়া খেলায় সে হাত দিয়েছে, তার একটি কিস্তি সে আজ জিতেছে।

"আর আমি? আমি যেন তার জুয়ার পরিত্যক্ত ঘুঁটির মত রইলাম পড়ে। হরিদাসই বলেছিল সেই মহাপুরুষের কথা, শেষের সেদিন কী ভয়ঙ্কর! হরিদাস যে শেষদিনের কথা বলেছিল, সেই শেষদিন নয়। সেই শেষদিনে মৃত্যু ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। আর আজকের এই শেষ দিন কী ভাবে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল, তখনো জানিনে। যদি জানতাম!

"হরিদাস চলে গেল। অনেক পরে জানতে পেরেছি, হরিদাসের জন্য আজকে স্টেশনে অপেক্ষা করছিল নিবারণ। কলকাতার সেই চায়ের দোকানের নিবারণ। আমি তখনো জানিনে যে, নিবারণের বাড়ি এই মীরগাঁয়ে, এবং সে হরিদাসেরই দূত। নিবারণ দাঁড়িয়েছিল হাত পেতে, তার প্রাপ্য পাওয়ার জন্য। হরিদাস দিয়েছিল তাকে মাত্র দুশো টাকা। নিবারণ বলেছিল, একি, এত কম কেন গো হরিদাসবাবু।

"হরিদাস: কমই পাওয়া গেছে নিবারণদা।

"নিবারণ হরিদাসকে ভয় করে। যেখানে ভয় সেখানেই অবিশ্বাস ও ঘৃণা। নিবারণ না বলে পারেনি: আমাকে ঠকাচ্ছ হরিদাসবাবু?

"হরিদাস কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, এটা সবে শুরু নিবারণদা, ভবিষ্যতে আশা আছে। কিন্তু সাবধান, আমাকে ভয় দেখিওনা, আর তেমন কিছু করতে যেওনা।

"নিবারণ বুঝেছিল, ভবিষ্যতে তাকে রাস্তা বদলাতে হবে।

"আমি অধীর আগ্রহে শনিবারের অপেক্ষা করছিলাম। হরিদাস আমার কতবড় শত্রু, তখনো জানতাম না। কিন্তু সে চলে যাওয়ার পর প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে আরো মর্মান্তিক ও রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে উঠল। নিজের প্রাণের ভয়ে প্রতিদিন আমাকে সামলেছে, রেখেছে চোখে চোখে, বাইরের সবকিছুর উপর। সারা বাড়িতে এখনো লোকের ভিড়। সেই ভিড় উঠতে বসতে আমারই চারপাশে ঘুরে ফিরে আসে। কেউ প্রশ্ন করে কলকাতার বিষয়, কেউ চোত্‌খণ্ডের। অর্ধেক জবাব দিতে পারি, অর্ধেক পারিনে। সবাই ভাবে, বেশী কথা বলতে পারছিনে নতুন জামাই ব'লে। ছাড়ে না কেবল কুসুম আর তার বাহিনী। পাড়াগাঁয়ের সেই চিরকালের ভয়াবহ ঠাট্টা করে মালতীকে টেনে টেনে এনে ফেলে কাছে। মালতী নিজেই শিউরে উঠে পড়ে যায়। কুসুম জিজ্ঞেস করে, বাব্বা! লেখাপড়া শিখলে কি মানুষ হাসতেও পারে না?

"বুঝি তাই। এ জীবনে চিরদিনের জন্য অবসান হয়েছে হাসির। দুদিন বাদেই এল শনিবার। পুরো ন'দিন আমি কলকাতা ছাড়া।

"আমার সমস্ত হাসি-কান্না, ভয়-সংশয়, সব কৃপণের ধনের মত মনের এক কোণে রেখেছিলাম লুকিয়ে। সবকিছু নিয়ে আমার এক আলাদা সত্তা অন্ধকার কোণে ঘাপটি মেরে বসেছিল সুযোগের অপেক্ষায়। আজ শনিবারে এল সেই সুযোগ। আর অপেক্ষা করতে পারিনে।

"কলকাতায় যাব শুনে মাধববাবু সঙ্গে লোক দিতে চাইলেন আমি জানালাম, তার কোনই দরকার নেই। আমি পরশুই চলে আসব। কিন্তু পিসীমা অন্নপূর্ণা বললেন, আমার খুড়িমার জন্য কিছু উপঢৌকন যাবে, সেটা নিয়ে যাবে নীলু।

"আমি বললাম, আমার সঙ্গে না গিয়ে কালপরশু আলাদা যাওয়াই ভাল।

"আমার সারা গায়ে বিয়ে বিয়ে গন্ধ। আমার রূপ গিয়েছে বদলে এ কদিনে। আমার সেই পুরনো মূর্তি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে এ বাড়িটার মধ্যে। তবু আমার পুরানো জামাকাপড় নিতে ভুললাম না। আমার এই সর্বনেশে অন্তরের রূপকে ঢাকতে আমার শেষ সম্বল।

"গরুর গাড়ি এসে আমাকে তুলে দিয়ে গেল স্টেশনে। লোকাল ট্রেনগুলি যে গরুর গাড়ির বাড়া তা জানতাম না। এত ধীরে ধীরে আর এত থামতে থামতে চলেছে, মনে হচ্ছিল, নিজে গিয়ে আগুন ঠেলি ইঞ্জিনে।

কিন্তু যতই এগুচ্ছি, ততই আমার বুকের মধ্যে ধুক ধুক করছে।

"যতই এগুচ্ছি আমার সব চিন্তা যাচ্ছে এলোমেলো হয়ে। আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু একজনকে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।

"কিন্তু কলকাতায় নেমেই, অবাক হয়ে তাকালাম। একি! এ কোন্ কলকাতা। যে কলকাতাকে আমার পেছনে রেখে গেছলাম, এতো সে কলকাতা নয়।

"এ কলকাতার যেন অনেক শ্রীহীন বিশৃঙ্খল কুৎসিৎ হয়ে গেছে। যেন আরো ঘিঞ্জিপুরনো লাগছে কলকাতাকে। মানুষগুলি সব আরো নির্বিকার উদাসীন হয়ে গেছে। এমন কি বাসের ড্রাইভারগুলিও অচেনা অচেনা। এলোমেলো বাড়ি, রাস্তা, গাড়ি, মানুষ। সবকিছু ঘিরে অদৃশ্য একজোড়া চোখ, কলকাতার চোখ অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে আছে যেন আমার দিকে।

"যখন বাসে উঠলাম, অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও কন্‌ডাক্টর ভাড়া চাইলে না। তখন আমার মনে হ'ল সমস্ত কলকাতাটা আমাকে অপাংক্তেয় করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। আমি রুক্ষ গলায় বলে উঠলাম, কন্‌ডাক্টর ভাড়া নাও।

"ঢুলুঢুলু চোখে ফিরে তাকাল। সেই চিরদিনের চেনা কলকাতার পাঞ্জাবী কন্‌ডাক্টর। নির্বিকার গলায় অন্যদিকে যেতে যেতে বলল, লেতেঁ হ্যায় বাবুজী।

"কেউ কেউ ফিরে তাকাল আমাকে দিকে। নির্বিকার অলস দৃষ্টি তাদের চোখে যেন বলছে, ও! সেই তুমি! চিনি, তোমাকে চিনি। তুমি পাপ করে ফিরছ সেই ছাপ তোমার চোখে মুখে। সারা কলকাতার সেই সব মেয়ে আর ছেলেছেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ফিরছ তুমি, যারা নির্যাতনেও অম্লান, মরণে যাদের ভয় নেই নিজের বিশ্বাসের কাছে।

"সমস্ত কলকাতাটা যেন আমাকে চিনে নিয়েছে আর ধিক্কার দিচ্ছে। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই তাই মনে হয়। চলন্ত ট্রামের লোকে আমার দিকে তাকালে মনে হয়, ঘৃণার চোখে দেখছে আমাকে। হাসলে মনে হয়, আমাকে দেখিয়ে

হাসছে। যারা কথা বলতে বলতে চলেছে, তারা যেন আমারই কথা বলছে। কেউ হঠাৎ কাউকে ডেকে উঠলে, আমিই চমকে দাঁড়িয়ে পড়ছি। যেন ডাক পড়েছে আমারই। যেমন গাড়িচাপা দিলে ড্রাইভারকে ঘিরে আসে জনতা, পকেটমারকে ধরলে আসে উদ্যত মুষ্টি নিয়ে, ঠিক তেমনি করে ঘিরে আসছে যেন সবাই আমাকে। এখুনি আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করবে পাপীকে।

"আমি দাঁড়ালাম। বাস থেকে নেমে হাঁটছিলাম, কিন্তু শক্তি পাচ্ছিনে মোটে। যেন পায়ের গোড়ালীর কোন ফুটো দিয়ে আমার দেহের সব রক্ত যাচ্ছে নেমে। ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে আমার সর্বাঙ্গ। হাঁপ ধরছে আমার বুকে। তবু আমি দাঁড়ালাম সহজ হয়ে।

"ওই অদূরেই দেখা যাচ্ছে আমাদের সেই গলির মোড়। যেখানে যাবার জন্যে আমি পাগলের মত এলাম ছুটে। কিন্তু ভয় আমাকে গ্রাস করেছে ক্রমাগত। সেখানে এতক্ষণে কী ঘটে আছে কিছুই জানিনি। হরিদাসের অসাধ্য কাজ তো কিছুই নেই। যে এই ঘটনার আগেই সব বলে দিতে চেয়েছিল সুপ্রীতিকে, সে যে ঘটনার পরে এসেও বলেনি, তা কেমন করে জানব। কেমন করে জানব, ওই গলিতে আমার জীবনের শেষ আগুন লেগেছে কিনা।

"কত লোক আসছে যাচ্ছে হয়তো আমারই ঘরের কাছ দিয়ে। সুপ্রীতি দরজাটিতে দাঁড়িয়ে হয়তো দেখছে প্রতিটি মানুষকে। তাদের মধ্যে খুঁজছে একজনকে। যার সঙ্গে মিলনের পর, একনাগাড় এতদিন ছাড়াছাড়ি থাকেনি সে কখনো।

"সেকথা ভাবতে ভাবতে আমার পা আবার ফিরে পেল শক্তি। অস্থির হয়ে উঠল মন। এত সর্বনাশের মধ্যেও একবার কাছে না গিয়ে আর থাকতে পারব না।

"বাড়ির কাছে এসে আমার বুকটা আবার ভীষণ ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। দরজার কাছে এসে দেখলাম সুপ্রীতি পেছন ফিরে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। মিঠু বসে বসে কাগজ কুচোচ্ছিল। আমাকে দেখে চমকে হাসতে গিয়ে থমকে গেল। এক মুহূর্ত বোধহয় অচেনা লাগল আমাকে। পরমুহূর্তেই লাফ দিয়ে চীৎকার করে উঠল, বাবা, বাবা, বাবা।

"সুপ্রীতি এদিকে ফিরতেই আমি তাদের দুজনকে সাপটে ধরলাম বুকে। মুহূর্তের জন্যে যেন আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে গেল। আমার পশ্চাতের সব আবর্জনা গেল মিথ্যে হয়ে। ওর দু'হাতও বেষ্টন করেছিল আমাকে। আমার হাত ধুকধুকনির মধ্যেও আমি ওর বুকের দ্রুত স্পন্দন পাচ্ছিলাম, শুনতে। বুঝতে পারছিলাম, ওর চোখের জল এসে পড়ছে, গলা বন্ধ হয়ে আসছে কথা বলতে গিয়ে। বুকের সুধায় ওর প্রাণের সব পাত্র উপচে পড়ছে। যার প্রতি অঙ্গের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছিল, সেই প্রতি অঙ্গের এক অনাস্বাদিত ভীরু অথচ আনন্দময় স্পর্শ অনুভব করছি আমি।

"সুপ্রীতি শুধু বলল, তুমি!

"আচমকা আমার বুক ঠেলে কী একটি বস্তু উথলে উঠতে লাগল। তাকে যতই চাপতে চাইলাম, ততই আমার বুক থেকে উত্থিত সেই বস্তু চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

"আমি শুধু বলতে পারলাম, দুগ্‌গি, তোমাদের ছেড়ে আমি একেবারে থাকতে পারিনে।

"শুনে ও বিস্মিত আনন্দে অথচ ছলছল চোখে তাকাল আমার দিকে।

"মিঠুটা উল্লাসে চীৎকার করতে লাগল আমাদের ঘিরে। সুপ্রীতিকে নিয়ে আমি বসলাম। এখনো তার মুখে রোগের ছায়া। বললাম, কেমন আছ সুপ্রীতি!

"সুপ্রীতি শুধু বলল, ভাল।

"সুপ্রীতি যেন সেই প্রথম পরিচয়ের যুগের মেয়েটি হয়ে গেছে। থুপি থুপি চুলের এলো খোঁপা বাঁধা উদাসিনী, নিস্তরঙ্গ সূর্যস্নাত জলের মত সেই কালো চোখ আর ঈষৎস্থূল রক্তাভ ঠোঁটের কোণে মিটমিটে হাসি। আমাকে দেখছে সে দু'চোখ ভরে। আবেগ তার অন্তস্রোতে। আমার সেই অল্প জলের উত্তাল ঢেউয়ের মতো ওর আবেগ সশব্দে আছাড়িপিছাড়ি করে না।

"কিন্তু যে বস্তুটি দেখতে পাইনি, তা হচ্ছে সুপ্রীতির অনুরাগভরা চোখের কালের পারিখা পার হয়ে এক চাপা বিস্ময়। বিস্ময় ওর আমার ভাব ভঙ্গি চেহারা পোশাক দেখে। কিন্তু হঠাৎ কিছু বলার পাত্রী সে নয়। জিজ্ঞেস করল, সত্যি তা হলে তোমার চাকরি হয়েছে?

"আমার সমগ্র ইন্দ্রিয় দিয়ে শক্ত করে রাখা বুকে আবার একটি মৃদু নাড়া লাগল। বললাম, হ্যাঁ, হয়েছে ?

"সুপ্রীতির সারা চোখে মুখে আলো ঝিকিমিকি করে উঠল। যে সুপ্রীতির ব্যক্তিত্বের কাছে আমার নিজেকে অনেকসময় নিষ্প্রভ মনে হয়েছে, সেই সুপ্রীতি, অনেকদিন বাদে কেমন যেন বেসামাল হয়ে উঠল। অনেকদিন বাদে তার মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যস্ততা দেখলাম। যে ব্যস্ততা দেখেছিলাম ওর মধ্যে সেই প্রথম সংসার পাতার সময়। ওর ঘর, ওর স্বামী, ওর সব কিছু নিয়ে, ওর মধ্যে সেই বিদুষী নাগরিককে পাইনি খুঁজে, জীবনের সেই গহনতায় সব মেয়েই এক এবং অভিন্ন। ওর সমগ্র মনের সব মাধুরীটুকু নিয়ে, উল্লাসে রচনা করবে ওর সংসার। অনেকদিন বাদে সুপ্রীতির গলায় আজ গুনগুনানি শুনছি। ওর পায়ে লেগেছে বনহরিণীর মুক্তির উল্লাস।

"বললাম, কোথায় যাচ্ছ ?

"সুপ্রীতি : তোমাকে একটু চা করে দিই আগে।

"আমি তার পায়ে পায়ে, আঁচলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কী গুনগুন্ করছ বল তো ? যেন জানি জানি মনে হচ্ছে।

"সুপ্রীতি সুরের মধ্যে কথা বলে উঠল,

আলোকের এই ঝরণা ধারায়
ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা, ধুলায় ঢাকা,
ধুইয়ে দাও।

"শুনতে শুনতে গুরুগুরু করে উঠল আমার বুকের মধ্যে। সুপ্রীতির ওই বৈরাগিনী হাসির অন্তরালে যেন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই গাইছে ওই গান। যে ধুলোর অন্ধকারে আমি লুকিয়ে রেখেছি আমাকে, সেইখানে গেছে ওর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কিন্তু একে কেমন করে ধুয়ে আমি সাফ করব !

"কিন্তু ও আমার দিকে দেখছে না ফিরে। যতদিন ছিলাম না এখানে, ততদিন অনেক দেখেছে ফিরে পথের দিকে। আজ ওর সেই চোখ বাইরে থেকে ফিরে এসে, ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে গানে গানে। আর না ফিরেও সব দেখার

মত ওর ঠোঁটের হাসিটুকু। আবার আপন মনেই বলে উঠল, সত্যি, কী দিনগুলিই না গেল!

"পরমুহূর্তেই সপ্রতিভ ছোট্ট মেয়েটির মত গ্রীবা বাঁকিয়ে গুন্‌গুনিয়ে উঠল,

বৎসরের আবর্জনা

দূর হয়ে যাক্ যাক্ যাক্।

"আমার বুকের যুগযুগান্তের পঙ্কিলতা ওর ওই যাক্ যাক্ ধ্বনি অজস্র ধারায় ধুইয়ে দিতে চাইল। তাই আমার বুক ওর গানের কথায় কাঁপছিল থরথর্ করে। যে অবুঝ ভয়ে কাঁপছিল আমার বুক, যেটুকু বুঝিনি তখনো, সে যুগান্তের এই পঙ্কিলতা রক্তধারা ব্যতিরেকে যাবেনা ধুইয়ে।

"মিঠুটা কথা জানেনা। সুর অনুকরণ করতে লাগল। কখনো ওর মায়ের কোল থেকে ঝাঁপ দিতে লাগল আমার বুকে। আমার বুক থেকে সারা ঘরের বুকে, গড়িয়ে মাড়িয়ে গেয়ে কথা বলে, ছোট্ট এ ঘরের কোণ চকিত করে তুলল উৎসবের ধারায়। আর সুপ্রীতি তার সব দিনগুলির কথা বলতে লাগল। কনকদি রোজ এসেছেন, দেখেছেন। আরো দুদিন এসেছিলেন ডাক্তারবাবু। বলেছেন, এইভাবে চিকিৎসা চললে সুপ্রীতি ভাল হয়ে যাবে। ওষুধ চলছে এখনো।

"কাজে কাজে, কথার ফাঁকে, সুপ্রীতির সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়িতে আমার বুক ভরে উঠছিল। যেন, আমার জীবনে এই প্রথম স্পর্শ লাভ ঘটছে সুপ্রীতির সঙ্গে। প্রতি রোমকূপে, রক্তবিন্দুতে আমার প্রথম স্পর্শের শিহরণ। যতটুকু পাই, ততটুকু অনেকখানি। এক ফাঁকে মিঠুর [illegible], আমার সমস্ত ভয় ও দুর্বলতা নিয়ে চুম্বন করলাম সুপ্রীতিকে। ও সভয়ে চারদিক তাকিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে হেসে কেমন একটু যেন অনুযোগের সুরে বলল, বেশ!

"বেশ! আবার বেশ! ব্যথা ও অনাদর তীক্ষ্ণ হুলের মত বিঁধল আমার বুকে।

"সুপ্রীতি ঠোঁট মুছে বলল, জানো বড় কষ্টে রাত কেটেছে গত সোমবার দিন।

"কেন?

"সোমবার দিন একটা বিয়ের দিন ছিল।

"বিয়ের দিন! আমার বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল। গত সোমবার সেই ভয়াবহ দিনটা যে অক্ষয় হয়ে গেছে আমার জীবনে। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, হ্যাঁ? বিয়ের দিন? ও! হ্যাঁ তা কি হয়েছে?

"সুপ্রীতি হেসে বলল, অত ভয়ের কিছু নেই। অমন চমকাচ্ছ কেন?
"আমি তাড়াতাড়ি সামলাবার চেষ্টা করলাম। সুপ্রীতি বলল, সেইদিনই আমাদের চাঁপার বিয়ে হ'ল। আর এ বাড়ির বাড়িওয়ালার মেয়ের বিয়ে গেল। সারাটা রাত ঘুমোতে পারিনি। শুভদৃষ্টির সময় এক কাণ্ড ঘটে গেল।
"ভয় হচ্ছিল, আমার বুকের হাতুড়ি পেটানো শুনতে পাবে সুপ্রীতি। জিজ্ঞেস করলাম, কী কাণ্ড?

"সুপ্রীতি হেসে উঠল। বলল, বলতে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। শুভদৃষ্টির সময়, বর মেয়ের দিকে না তাকিয়ে কেবলি অন্যদিকে তাকায়। তারপর বোঝা গেল, বর রাতকাণা। বেচারি!

"বেচারি! যেন, আমারই ঘটনার উল্টোদিকটা বলছে কেউ রহস্য করে। কথাটি ব'লে, সুপ্রীতি ওর থুপি থুপি চুলের মাথাটি দুলিয়ে হেসে উঠল ছেলে মানুষের মত। যে দুঃখের হাসিটুকু ও সেই বিয়ের রাত্রে হাসতে পারেনি। হেসে হেসে যেন বিদ্রূপ করে বলতে লাগল আমাকে, ঠিক তোমার সেই চুরি করে বিয়ে করা অন্ধ মালতীর মত। হাসতে হাসতে সুপ্রীতির মুখ করুণ হয়ে উঠল। বলল, সেই রাত্রে এত কষ্ট হচ্ছিল। যতই তোমার মুখটি মনে করবার চেষ্টা করছিলুম, ততই তোমার মুখ আমার কাছ থেকে হারিয়ে যেতে লাগল। কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। শেষটায় কান্না পেতে লাগল। কেবলি মনে হতে লাগল, এই তো সন্ধ্যেবেলাতেও তোমার মুখ পরিষ্কার দেখেছি, এখন কেন পাচ্ছিনে। কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি! কোথায়!

"সুপ্রীতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল। আমি সভয়ে তার মুখ আমার বুকের কাছে এনে ঢেকে ফেললাম। বলতে বলতে ওর গলা যেমন ধরে আসছিল, তেমনি ভয়ের মধ্যেও একটি রুদ্ধ কান্নার বেগ ঠেলে উঠছিল আমার বুকে। সুপ্রীতি আবার বলল, সত্যি কী কষ্ট যে হচ্ছিল। কেঁদে কেঁদে

ঘুমিয়ে পড়ছিলুম। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চমকে উঠে মনে পড়ে গেল তোমার মুখ।

"তারপর হঠাৎ আবার বলল, কিন্তু সত্যি, তুমি যেন বদলে গেছ।

"চমকে উঠে বললাম, কোথায় বদলেছি?

"সুপ্রীতি হেসে বলল, এ কদিনের মধ্যেই তোমার সব কিছুই কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।

"আমি আর ভয় চাপতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠলাম। আর যাতে সে আমার মুখ দেখতে না পায়, সেইভাবে আমার বুকের কাছে তার মুখ চেপে রাখলাম। বোধহয়, আমার এই ভীরু মুখ দেখবার ভয়ে, মুখে দেখিয়ে ধরা পড়ার ভয়ে, বুকে চেপে তাকে হত্যাও করতে পারতাম। সে আবার বলল, সত্যি তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন, এ ঘরে তোমাকে মানায় না।

"কী যে বলো! বলে আমি হাসতে লাগলাম। যতই হাসতে লাগলাম, ততই বুঝতে পারলাম, আমি আমার আগের জীবন হারিয়ে ফেলেছি। আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি, আমি জোর করে ঢুকেছি এই ঘরে। আমার ভয় হতে লাগল সুপ্রীতিকে। ভয় হতে লাগল এই জন্যে যে, তার প্রতিটি কথা যেন দুই চোখওয়ালা চোরাবালির মত আমার প্রতিটি পদক্ষেপের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, বেষ্টন করছে, পাতছে ফাঁদ। কখন আমি ধরা পড়ব। কখন আমি বলে ফেলব ওকে সব কথা, আমার মনের সব আধি-ব্যাধি যন্ত্রণা, সেই ভয়। আমি যতই ওর কাছে কাছে, ততই আমার ভয়। আমি যত ব্যাকুল ভালবাসা, বাসনা নিয়ে ছুটে এসেছিলাম, ততোধিক আতঙ্কে আমার এখন পালাতে ইচ্ছে করছে।

"এই মুহূর্তে আমার মনে হল, এ বিশ্বসংসারে আমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছি, চেয়েছি, তার কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি দূরে পালিয়ে থাকতে হবে আমাকে। আমার সর্বগ্রাসী ভালবাসা দিয়ে প্রথম আর শেষ আঘাত দিয়েছি তাকেই। কিন্তু আমার এই আঘাতের ওপরে ছদ্মবেশী রূপকে যতই ঢাকতে চেষ্টা করব, ততই পালাতে হবে। ততই পালাতে হবে, যতই সুপ্রীতিকে হারাবার ভয় আমাকে গ্রাস করবে। জীবনের এ কী ভয়াবহ বিড়ম্বনার জালে

জড়িয়ে পড়লাম আমি। এখন আমার কেবলি ভাবনা হল, কখন, কোন্ মুহূর্তে ওকে আমি ব্যক্ত করব সব।

"তারপর এ বাড়ি পাল্টাবার কথা উঠল। সামনেই একটি দোতলা বাড়ির ছোট ফ্ল্যাট খালি আছে। আমি তাড়া দিলাম, আগামীকালই সেখানে উঠে যাবার। সুপ্রীতি রাজি হল। কিন্তু বাধা পড়ল। চৈত্রমাস পড়ে গেছে। আমাদের ইচ্ছে থাকলেও বাড়িওয়ালা ভাড়াটে নিতে পারবে না এমাসে। তবু আমি অগ্রিম ভাড়া দিয়ে ভবিষ্যতের পথ খোলা রাখলাম। এ বাড়ির বাকী ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। এ বাড়ির বাড়িওয়ালা এক সময়ে আমাকে আইনের ভয় দেখিয়েছে। সে জন্যে আজ ক্ষমা চাইছে সে। সে বলল, কিছু মনে করবেন না, আমরা সবদিক দিয়েই বড় ছোটমানুষ।

"আর আমি ভাবলাম, মনুষ্যত্ব বজায় আছে সকলের মধ্যেই। নেই খালি আমার। এর মধ্যেও সারাদিনই আমার বুক কেঁপেছে, কখন এসে হাজির হবে হয়তো হরিদাস কিংবা মীরগাঁয়ের কেউ এসে হাজির হবে হয়তো। হয়তো বা এতক্ষণে জানাজানি হয়ে গেছে সবই। শাস্তিদাতারা এবার আসবে সবাই সদলে। তাই চমকে চমকে উঠেছি বাইরের পদশব্দে লোকের কণ্ঠস্বরে।

"সন্ধ্যাবেলা পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হলাম হরিদাসের বাড়ির দরজায়। পাপের চারদিকে আঁটঘাট বাঁধা আছে কিনা, সেই চিন্তা আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে।

"পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটি খুলে সামনে দেখা দিলেন বীণাদি। একটুও বিস্মিত না হয়ে ডাকলেন, ঘরে এস।

"বীণাদির যে চোখ আমি দেখেছি বড় করুণ, আজ সেই চোখের চাউনি যেন কেমন ঠাণ্ডা অথচ তীব্র। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ কষায় উঠল চমকে। সেই মুহূর্তেই আমার মনে হল, উনি আমার সব কথাই জানেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম, বীণাদির দুই ছেলে। ছেলে দুটি বিমর্ষ উৎকণ্ঠিত চোখে আমার দিকে তাকাল। কেমন যেন ভীত অসহায় মনে হল শিশু দুটিকে। ভিতরে আর একটি ঘর ছিল। বীণাদি

বলতেই, দুজনে আমার দিকে আর একবার তাকিয়ে, গুটি গুটি চলে গেল ভিতরের ঘরে।

"কেমন যেন করুণ ছত্রছাড়া শ্রীহীন সারাটি বাড়ি। অথচ চেয়ার টেবিল বিছানা আসবাব, মোটামুটি সবই আছে। তবু কী এক দুর্ভাগা ছায়া রয়েছে ঘিরে। আমার আজ আবার মনে পড়ল বীণাদির পিত্রালয়ের কথা। ওঁদের সেই বাড়ি, সেই পরিবেশ, সেখানে সেই বিদুষী সুন্দরী মেয়ে বীণাদি এখানে যেন ওঁর প্রেতিনী হ'য়ে ফিরছেন।

"বীণাদি আমার দিকে মুখ ক'রেও অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছেন নির্নিমেষে। এ অবস্থার মধ্যে, চাকরী করার পরিশ্রমে ও দুঃখেও সারা চেহারার মধ্যে ওঁর কোথাও কাঠিন্য বা রুক্ষতা দেখা দেয়নি। বরং সারা চেহারাটির মধ্যে, শিথিল বেশবাস, ক্লান্ত বিহ্বল ভাব। এখনো মুখখানি কোমল এবং করুণ। কিন্তু এই মুহূর্তে ওই অপলক ঠাণ্ডা চাউনি, এই রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। যেন আমাকে ভীষণ কিছু শোনাবেন বীণাদি। আমার পর্বত প্রমাণ সংশয় উৎকণ্ঠার চূড়াটিকে একটি কথার ঘায়ে, নামিয়ে এনে দলিত করবেন আমাকে।

"আমি যখন আর কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারছিলাম না, ঠিক তখনি বীণাদি, দূরাগত কণ্ঠস্বরে বললেন, নিখিলেশ, আমি সবই শুনেছি। চকিতে মুখ ফেরাতে গিয়েও বুঝলাম, বীণাদি আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। মনে হল, আমার মুখের দিকে তাকাতেও বীণাদির বড় ঘৃণা! আমি ব্যাকুল হয়ে কিছু বলতে চাইলাম বীণাদিকে। তার আগেই আবার উনি বললেন, ও (হরিদাস) বলেছে, আমাকে তোমার কাকীমা সাজতে হবে।

"আবার কয়েক মুহূর্ত নীরব। আমি আমার সমস্ত অক্ষমতা দিয়ে বুক শক্ত করতে লাগলাম। এবার নিশ্চয় দারুণ ঘৃণায় ও রোষে ফেটে পড়বেন বীণাদি। কিন্তু তখনো অশ্চর্য শান্ত নীচু গলায় বললেন উনি,আমি তাই সাজব নিখিল। ও আমাকে যা বলেছে, আমি তাই করব। ওর কথা তো আমি ঠেলতে পারবনা।

"আমি ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক। বীণাদি চকিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, কিন্তু তোমার জন্য নয় নিখিল। তোমার

মুখ চেয়ে নয়, তোমার কৃতজ্ঞ হওয়ার কিছু নেই আমার কাছে। ও যেদিন বলবে, মীরগাঁয়ে গিয়ে আমাকে সব কথা ফাঁস করে দিয়ে আসতে হবে, আমি তাও দেব।

"আতঙ্কে বিদ্যুৎ চমকে গেল আমার শির দাঁড়ায়। কী বলব, ভেবে পাচ্ছিনে। মূঢ় ভয়ে তাকিয়ে আছি ওঁর মুখের দিকে। চিনিনে, কিছুতেই চিনতে পারছিনে এ বীণাদিকে। একি শুধু আমার প্রতি ঘৃণা না আর কিছু।

"বীণাদি আবার ফিরলেন আমার দিকে। দেখলাম, চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল চিক্‌চিক্ করছে, কিন্তু মুখ অবিকৃত। বললেন, এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

"কথাটি যেমন অপ্রতিরোধ্য ভয়ঙ্কর বেশ ধরে এল, ঠিক তেমনি এই মুহূর্তে বীণাদির দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম বিস্মিত ব্যথায়। দেখলাম, এ সেই আট বছর আগের বীণাদি, যিনি উন্মাদিনী হরিদাসের প্রেমে। আশ্চর্য! আজো সেই প্রেমের গতি এমনি তীব্র যে, ওর পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের বোধাবোধ পর্যন্ত যাচ্ছে হারিয়ে।

"এতক্ষণে আমি শুধু বলতে পারলাম, বীণাদি!

"বীণাদি আবার বললেন ফিস্‌ফিস্ করে, এক একসময় নিজেই বড় অবাক হই ভেবে, ওকে ছাড়তে পারলুম না ঠিকই, এমন করে ওর সামনে হাজির হতে পারলুম না কোনদিন যে, ওর বাইরের সমস্ত কিছুর চেয়ে আমি বড় হয়ে উঠব। এ আমার অহঙ্কার নয়, কিন্তু এতবড় অপমানের পরেও ভাবছি, কেমন করে এতটা তুচ্ছ হয়ে গেলুম ওর কাছে। আমার একটু ক্ষমতাও কি নেই।

"হঠাৎ একটু হেসে আবার বললেন, নেই, হেরে গেছি একেবারে। ওর বাবা যে অঙ্কুর পুঁতে গেছলেন, আজ সেই বিষবৃক্ষের ছায়াই আমার আশ্রয়। তাতে কোনদিনই আমি অমৃত ফলাতে পারব না, এখন আমি নিজেই বিষাক্ত হয়ে গেছি। তবু ওকে আমি হারাতে পারব না। আমার বোনেরা বলেছে, এ নাকি আমার পারভারসন্। ভাগ্যি লেখাপড়া শিখেছিলুম, কিছুদিন রাজনীতিও করেছিলুম, তাই ওরা আমাকে অশিক্ষিতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলার মেয়ে বলে গাল দিতে পারেনি।

"তারপরে যেন হাঁফ ধরে গেছে, এমনিভাবে বলতে লাগলেন, আজ আমি চাই, ও ওর সমস্ত কিছুর মধ্যে আমাকে টেনে নিক। ওর পাপ, ওর পুণ্যি, ওর জুয়াখেলা, মদ খাওয়া, ওর সমস্ত নারকীয় লীলার মধ্যে, মাড়িয়ে দলিয়ে নিঃশেষ করে দিতে চাই। ও আমাকে গ্রাস করুক, আমার সমস্ত সত্তা পুড়ে পুড়ে ছাই হোক ওর পাপের মধ্যে। আমিও পাপিষ্ঠা হতে চাই।

"আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। দেখলাম, বীণাদির চোখে এবার সত্যি আগুন জ্বলছে ধ্বক্ ধ্বক্ করে। মনে হল এই আগুনই বোধহয় শেষ পর্যন্ত মোড় ফিরিয়ে দেবে হরিদাসের।

"কিন্তু আমি যেন আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছি কোথায়। মনে হল, এ সংসারের সমস্ত পাপ যেন আমাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। আমিই বুঝি সমস্ত কিছুর মূলে। এখানে এসে আমি যেন আমার কৃতকর্মের সমস্ত ভয়ঙ্করতাকে পেলাম দেখতে।

"ঠিক এই মুহূর্তেই বীণাদি বলে উঠলেন, কিন্তু তুমি এ কি করলে নিখিল?

"অকস্মাৎ আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠে বললাম, সত্যি এ কি করে বসলাম আমি।

"বীণাদি তীব্র ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, তুমি নিখিল কী করে হারিয়ে গেলে ওর ক্ষমতার মধ্যে? তার জন্যে তো একমাত্র আমি ছিলুম বলেই জানতুম। নিখিল, ও যা চায়, আমি তা-ই। তাই ও আমাকে করুণা করে। তুমি তো তা পারবে না। না পারলে যে তোমার দুঃখ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

"হরিদাসের মুখ ভেসে উঠল আমার সামনে। এখনো আমার রক্তে কিছু শক্তি আছে। তাই এই ভয়াবহ বাস্তব সত্য শুনেও জ্ঞান হারাচ্ছিনে। অসহায়ভাবে বলে উঠলাম, কী করব আমি বীণাদি।

"বীণাদি বললেন, কিছু করার নেই আর।

"এতক্ষণে বীণাদি নিজের প্রসঙ্গ ছেড়ে আমার চিন্তায় এলেন ফিরে। আবার বললেন, সুপ্রীতির কী হবে নিখিল?

"হয়তো আমি সশব্দে চীৎকার করে উঠতাম। কিন্তু নিজেরই আঙুল দংশন করে ভয়ের ও কান্নার উত্তেজনা প্রশমিত করলাম। গলা দিয়ে স্পষ্ট স্বর ফুটল না। বললাম, বীণাদি, ওকে হারাবার ভয়েই—

"আমার স্বরে স্বর মিলিয়ে বলে উঠলেন বীণাদি, ওরই উপর আঘাত করলে তুমি। তোমার মত মানুষেরা এমনি করেই নিজের সর্বনাশ করে।...আমি আমার এ মুখ আর কোনদিন সুপ্রীতিকে দেখাতে পারব না। নিখিল, তোমার এ ব্যাপারে জড়িয়ে আমি নিজের সর্বনাশের কথা ভাবছিনে। কিন্তু তুমি হারাবে, ভেবে আমিও ভয় পাচ্ছি।

"কী যে হারাব, সে কথা জানেন বীণাদি। আমার আর এখানে থাকতে সাহস হচ্ছিল না। হয়তো শেষপর্যন্ত সত্যই আমি আর মস্তিষ্ক স্থির রাখতে পারব না। হয়তো আরো এমন কিছু শুনতে হবে, যা শোনার সাহস আমার নেই। আমি পালাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। পালার সমস্ত জায়গা থেকেই আমাকে এখন শুধু পালিয়ে ফিরতে হবে।

"বীণাদি বললেন, আমার এখানকার জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই। তোমার জন্যে আমার যেটুকু করার, তার কোন অন্যথা হবে না। আর একটি কথা জেনো, ও যদি নেহাৎ দায়ে না পড়ত, তা হলে আমাকে এসব কথা ঘুণাক্ষরেও জানাত না। সেজন্যে, আমাকে জানানোর ব্যাপারটা তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে নয়।

"হঠাৎ আমার যেন মনে হল, বীণাদি অসীম ক্ষমতাশালিনী। উনি ইচ্ছে করলেই আমাকে বিপদমুক্ত করতে পারেন। ভাবলাম, বীণাদির পায়ে পড়ে মুক্তি চাই। ততক্ষণে আমি দরজার কাছে গিয়েছি।

"বীণাদি বললেন, নিখিল, তুমি তোমার কথা ভাবো। সেই মুহূর্তেই বীণাদিকে বড় অসহায় মনে হল। আমি বেরিয়ে এলাম।

"আমার সমস্ত শরীরে অসহ্য ভার। এই কলকতার রাস্তাঘাট, আলো দোকান, নরনারী, সবই যেন কুৎসিত পুতুল ও খেলনা। সবই যেন দমে হাসছে, চলছে। একদিন আমার কাছে সবই খারাপ লাগত। আজ তার চেয়ে আরো বেশি খারাপ লাগছে। অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরলাম শান্ত হওয়ার জন্যে। আমার মুখ চোখ থেকে সব উত্তেজনা ও ভয়ের চিহ্ন দূর করার জন্য।

"তারপর বাড়িতে এসে শুনলাম, সুপ্রীতি গুন্ গুন্ করছে সেই গান। প্রথম দিনের গান, আমি কী গান গাব যে, ভেবে না পাই।

"তার এই গান হারিয়ে যাওয়া উল্লাসের মধ্যে, তার সর্বাঙ্গে সুরতরঙ্গের দোলার মধ্যে, এ কোন ভয়াবহ রোগবিস্তারী মূর্তি নিয়ে আমি ঢুকতে যাচ্ছি। পালাই! অপরাধের যন্ত্রণায়, যত অশেষ চুম্বনের বাসনা আমার ঠোঁটে, আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে মুড়ে রাখার আকাঙ্ক্ষায় যত আমি পাগল, ততই পালাবার রাস্তা আমাকে ডাকে হাতছানি দিয়ে।

"বীণাদির কাছ থেকে এসে ভয় যেন আমার আরো বেড়েছে। প্রতিটি ক্ষণ আমার কাটতে লাগল ভয়ে ভয়ে। রাত্রে ঘুমোতেও ভয় হল যদি ঘুম ভেঙে দেখি, সুপ্রীতি সব জেনেছে আমার স্বপ্নের মুখে।

"সোমবার সকাল এল আমার বিদায়ের পরোয়ানা নিয়ে। বেরুতে হবে আমাকে। যত ভাবছি, ততই মন পেছুচ্ছে, ছটফট করছে। সুপ্রীতি রেঁধে বেড়ে আমাকে খাইয়ে দিল। বলেছিলাম, রান্না থাক, ওখানে খেয়ে নেব।

"সুপ্রীতি বলেছিল, না, আমার কাছ থেকে না খেয়ে যাওয়া হবে না। ওখানে গিয়ে কী জুটবে, কে জানে!

"ঠিকানা চাইল। দিতে পারলাম না। বললাম, পরে ঠিকানা জানাব। মিঠু বললে, আবাল্ কবে আথবে?

"বললাম, শীগ্গিরই আসব বাবা।

"মিঠু: তুমি এলে, তোমাল্ কাছে ছোব।

"আমার বুকের মধ্যে কান্না ফুলছিল। মনে হল, আমি যেন আমার প্রাণ ধন সব ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। না গেলে কী হয়? সেকথা ভাবতেও পারিনে। পাপের ভরাডুবি আধডুবির চেয়ে ভাল। আমি যে চাকরি নিয়েছি।

"শেষটায় সুপ্রীতিকেই করুণ হেসে বলতে হল, আটটা পঞ্চাশের গাড়ি যে ফেল হয়ে যাবে।

"তবু চলে আসার সময় সুপ্রীতি সিঁড়িতে দরজার পাশে হঠাৎ ধরল। বুকের জামা ধরে বলল, একটি সত্যি কথা বল।

কেঁপে উঠেছিলাম। বললাম, বল।

"সুপ্রীতি বিষণ্ণ চোখে বলল, প্রজেক্টের এ চাকরিটা কি খুব কষ্টের?

"কেন বলতো?

তোমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। যেন তোমার কিসের একটা যন্ত্রণা ভাবনা রয়েছে।

"হাসবার চেষ্টা করে বললাম, না, তেমন খুব নয়। যেটুকু আছে, সেটুকু অভ্যাস হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই।

"ট্রেনটা হু হু করে ছুটে চলেছে সামনের দিকে। গাড়ি যত ছুটছে, আমি যেন ততই পেছুচ্ছি। আমি চলেছি, তবু যাওয়া এখনো যেন স্থির করে উঠতে পারিনি। কে যেন আমার ভিতর থেকে চীৎকার করছে, ফিরে চল্, ফিরে চল্।

"হঠাৎ আমার সামনের দরজাটি খুলে গেল। বোধহয় ছিটকিনি বন্ধ ছিল না। তীব্র শাসানির স্বরে বাতাস ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, নুড়িপাথরের রাশি ছিটকে যাচ্ছে। ছিটকে সরে যাচ্ছে কয়েকটা লাইন। গাড়িটা বেঁকে যাচ্ছে। নীচের চলন্ত নিমেষহারা পাথর আমাকে যেন ডাক দিতে লাগল, এইখানে, এইখানে নেমে আয়। আমার সর্বাঙ্গে একটি অদ্ভুত ঝাঁকুনি অনুভব করতে লাগলাম। কে যেন আমাকে ঠেলছে, দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে।

"একটি গ্রাম্যযাত্রী হাই তুলতে তুলতে নিশ্চিন্তে দরজাটি বন্ধ করে দিল। দিয়ে আবার বসে পড়ল চুপচাপ। আমার কপাল থেকে তখন ঘাম ঝরছে টপ্ টপ্ করে। একটু পরেই এল মীরগাঁ।

"সুপ্রীতিকে বলেছিলাম অভ্যাস হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই।

"অভ্যাসের চেয়েও বড়, আমি যেন হাওড়া থেকে মীরগাঁগামী আপ ডাউন লোকালের একটা তৈলাক্ত পিস্টন রড হয়ে গেলাম, কেবলি যাওয়া আর আসা। কোন এক ড্রাইভার ঘোরায় যন্ত্র আর নিষ্ঠুর বেগে আসে স্টিমের ধাক্কা। আমার বুক ভরে মিথ্যার পসরা নিয়ে, ছদ্মবেশে শুধু কলকাতা আর মীরগাঁয়ে যাওয়া আসা।

"মাসখানেক পরে মাধববাবু নিশ্চিন্তমনে গেলেন বৃন্দাবনে। যাওয়ার সময় মাধববাবু বলে গেলেন, যে দুজন কর্মচারী রইল, ওরা সৎ ও খুব করিৎকর্মা। সব ঝুঁকি ওরা দুজনেই সামলাতে পারবে। তবু যেন আমি খবরটা অন্তত

রাখি। মোস গেলে, আমার যা দরকার, অর্থাৎ টাকা পয়সা তা আমি যেন নিই। আর সবই তো আমার নিজের, সুতরাং দায়িত্ব আমারই।

"এক মাসের মধ্যে আমি চারবার কলকাতা গেছি। আরো বেশি যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেও যেতে পারিনে। সবদিক থেকেই বাধা। সুপ্রীতির কাছেও সেটা সংশয়ের। মীরগাঁয়েও অস্বস্তি দেখা দেবে।

"তবু, যত আমি কলকাতা যাওয়ার জন্য পাগল হই, কলকাতায়, সুপ্রীতির সপ্তাহান্তের বিরহ ও আনন্দময় পরিবেশে, মিঠুর ছোট ছোট ব্যাকুল হাতের ডাক দেওয়ার মধ্যে ততই ভীত হই, হাঁপিয়ে উঠি। আমি ততই পালাবার পথ খুঁজি। আমি আসি ছুটে ছুটে, তারপর পবিত্র ওষুধির গন্ধে ফণা গুটোনো সাপের মত খুঁজি গর্ত।

"যত মুখ ফিরিয়ে রাখতে যাই মীরগাঁ থেকে, মীরগাঁ তত আমাকে ঘাড়ে ধরে টানে।

"ভেবেছিলাম, মালতীর জন্য আমার কোন ভাবনা নেই। তাকে আমি আমার ঠিক পথে রেখেছি।

"কিন্তু ভুলে গেছি, মালতী একটি যুবতী মেয়ে। আমার স্পর্শের বাইরে সে রয়েছে প্রতিজ্ঞানুযায়ী। কিন্তু তার বুকের রক্তগোলাপটি পাপড়ি মেলছে। চোখে না দেখে, স্পর্শ না করেও তার অন্ধ বুকে ভালোবাসার কুঁড়ি ফুটছে। রক্তে যার সেই বাঁশীটি বেজেছে, সে যে এমনিতেও অন্ধ। স্পর্শে তার কী প্রয়োজন।

"আমি দোতলার যে ঘরে বসি, পড়ি, ছটফট করে মরি. মালতী ফাঁক পেলেই যেন গন্ধে গন্ধে আসে সেই ঘরে। কখনো নিঃসাড়ে আসে, কখনো সশব্দে। আজকাল সে আমাকে তুমি করে বলে। আশ্চর্য তার অনুভূতি আড়াল থেকে দেখেছি, আমি যদি ঘরে না থাকি, সে ধীরে ধীরে আসে আমার চেয়ারের কাছে। চেয়ারটি না ছুঁয়েই জিজ্ঞেস করে, তুমি নেই এ ঘরে, না?

"একমুহূর্ত স্তব্ধ থাকার পরেই, সে চেয়ারটিতে হাত দেয়। তার চোখের চকচকে নীল মণি দুটি যেন কী দেখে এদিক ওদিকে। তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে নিঃশব্দে। প্রেমে পড়া চক্ষুষ্মতীরাও এমনি করেই হাসে। হেসে আঁচল দিয়ে মুছে দেয় শূন্য চেয়ারটি। আমি বিতৃষ্ণা নিয়ে সরে পড়ি।

"এই বোধহয় বিশ্বের নিয়ম। যাকে চাইনে সে যত কাঙাল হয়, ততই তাকে কুরূপ লাগে। বিতৃষ্ণা জাগে। যাকে চাই সে যত দূরে যায়, ততই অপরূপ।

"মালতীর এই বারেবারে আসা আমাকে তাড়নাই করে শুধু। সে দেখতে পায়না আমার মুখ। নইলে অনেকদিন আগেই হয়তো আমি ধরা পড়ে যেতাম। সে এসে ঘরে ঢুকলেই আমার সর্বাঙ্গে একটা নিঃশব্দ প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। অসহ্য যন্ত্রণা ও বিতৃষ্ণা বোধ করি। আমার এই জীবন আসল বটে। কিন্তু পাপের উত্তেজনায় প্রতিমুহূর্তে রক্তধারা দলিত মথিত আবর্তিত হচ্ছে। তার থেকে উদ্ধারের জন্য যখন এই নিঝুম গ্রামে নিরালায় সুপ্রীতিকে খুঁজি, পাখীর কাকলী শব্দে মিঠুর জন্যে মুখ বাড়াই জানালায়, ঠিক সেই সময় মালতী আসে তার সমস্ত অধিকার নিয়েই। তার সারাদিন আমার কাছে কাছে আসা, ঘোরাঘুরি করাই যে একমাত্র কাজ। তার রক্ত তাকে ঠেলে ঠেলে দেয় পাঠিয়ে।

"ওর হৃদয়ের সঙ্গে যে ওই রক্তধারার ঠেলাঠেলি চলেছে অনুক্ষণ। হৃদয় ওকে বাঁধ দিয়ে রাখতে চায় আমার মন রক্ষার্থে। ফুলশয্যার রাতে আমার দেওয়া কথার মান রাখতে। কিন্তু রক্তধারা সেই বেড়াটিকেই ভাঙতে চায় বারে বারে। ওর নিষ্পাপ মনে ছলনার পথ দেয় দেখিয়ে। ওই ছলনার পথ ধরে ধরেই আসে ও।

"অন্নপূর্ণা যে এসবের কিছুই জানে না, তা আমি বুঝি। এমন কী কুসুমও টের পায়নি। মালতীর চোখ না থেকেও চক্ষুষ্মতী চেয়ে সূক্ষ্ম চাতুর্য আমাদের পরস্পরের সম্পর্কটিকে রেখেছে আড়াল করে।

"মালতী আসে, এসে দরজার কাছে এসে ঠিক টের পায়, আমি আছি। বলে, তুমি বসে আছো, না ?

"হ্যাঁ।

"ঘাড় কাৎ করে লজ্জায় ও সঙ্কোচে বলে, একটু যাব ?

"বলতে হয় : এস।

"কাছে এসে তার চোখে মুখে লজ্জা দেখা দেয়। বলে, বসব একটু ?

"বলি : বস।

"ঠিক খালি চেয়ারটিতে গিয়ে বসে। কোন কথাই বলতে পারিনে। কী বলব। কিন্তু মালতী হঠাৎ বলে, পড়ছ বুঝি?

"না পড়লেও বলি, হ্যাঁ।

"সেই পরীক্ষার পড়া?

"হ্যাঁ।

"ততক্ষণে আমার গলার মধ্যে রুক্ষতার আভাস ওঠে ফুটে। সে বলে, আচ্ছা এখন তা হলে যাই।

"তখন একবার শান্তিপুরী লৌকিকতার মত আমাকে বলতে হয়, কেন, বোসনা।

"মালতী শুনে অদ্ভুত হাসে। বুঝতেও পারতাম না যে, মালতী তার অনুভূতি দিয়ে আমার সমস্ত বিতৃষ্ণা ও বিমুখতা বুঝতে পারে। 'আবার আসব' বলে সে চলে যায়।

"এমনি যাওয়ার সময়, দোতালার দালানে একদিন দেখলাম, সে দেয়ালে মুখ চেপে আছে। একটু পরেও দেখলাম তার চোখে জল। আমার নিস্পৃহ নীরবতায় সে পুড়ছে ভেতরে ভেতরে।

"তবু আসে। কলকাতার কথা শুনতে চায়। আমার পড়ার কথা শুনতে চায়। কখনো হাতে করে নিয়ে আসে বই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, তার মধ্যে বিশেষ করে রজনী। বলে, কুসুম আমাকে পড়ে পড়ে শোনাত। (বলতে ভুলেছি, কুসুমের বিয়ে হয়ে গেছে) তুমি একটু শোনাবে?

"আমি তিক্ত বিষ গেলার মত শোনাই মাঝে মাঝে। শুনতে শুনতে মালতী কাঁদে, হাসে, রাগ করে, এমন কি চরিত্রগুলি সম্পর্কে মন্তব্যও প্রকাশ করে। কখনো আমাকে পুকুরঘাটে নিয়ে যেতে চায়। গোলাবাড়ির উত্তরে, আম বাগানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

"এর পরে ও এলে মাঝে মাঝে নিঃশব্দে উঠে পালাই। ও 'ঘরে আছ?' জিজ্ঞেস করেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর দৃষ্টিহীন চোখের ঝকঝকে নীল আঙ্গিনায় কেমন একটু বিস্ময় চমকাতে থাকে। বুঝতে পারিনে, ও সবই টের পাচ্ছে। যত টের পাচ্ছে ততই ওর মনে বাড়ছে ভয় ও সন্দেহ।

"কখনো কখনো আচমকা নিঃশ্বাসের শব্দে চমকে ফিরে দেখি, দরজাটির কাছে ও দাঁড়িয়ে আছে চুপ ক'রে। যেন ও সবই দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চমকে উঠেছি। পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে, ও অন্ধ, দেখতে পায়না। তবে? সংশয়ে ও ভয়ে তাকিয়েছি ওর চোখের দিকে। আশ্চর্য! আমি ফিরলেই ও টের পায়। হয়তো কোথাও একটু আধটু শব্দ হয়ে যায়, কিংবা আমার নড়াচড়ার শব্দ যায় কোনরকমে। তখন বড় অপ্রস্তুত হ'য়ে বলে, পিসিমা তোমাকে চান করতে যেতে বলেছে।

"এমনি কতবার যে চান করতে, খেতে ডাকতে আসে। এমন কি চাও নিয়ে আসে নিজের হাতে। বাড়ির সবাই ভয় পেত প্রথম প্রথম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসত ঝি। এখন আর কেউ আসেনা। জানে, ও ঠিক নিয়ে আসবে।

"আসবে, দরজার কাছে এসে ঠিক ঘোমটাটি তুলবে। ওর হয়েছে উল্টো। এ বাড়ির মেয়ে ও, ঘুরতে ফিরতে ঘোমটা দিতে হয় না ওকে। আমার কাছে এসে দিতে হয়, আর দেওয়ার সময় বিচিত্র সুন্দর একটি লজ্জা চাপা ঠোঁটের কোণে দেখা দেয়।

"এই আসাআসি ওর কাছে যত করুণ, আমার কাছে ততই বেদনা ও যন্ত্রণাদায়ক। যেন আমার অতি ভয়াবহ বন্দীদশা, এসব শুধু এ বাড়ির বন্দীশালার খেলা।

"তবু ওর ভিতর দুয়ারের খোলা কপাট দিয়ে নিরন্তর বাতাস বহে হু হু করে। রক্তের দোলায় ও অবুঝ হয়ে ওঠে।

"এর পরে, যখন ছুটে যাই কলকাতায়, তখন যেন বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে, মন আমার বিটলে পাখীটার মত ডিগবাজী খেতে থাকে। কিন্তু কলকাতার মধ্যে ঢুকলেই, পাপ চুষে খেয়ে ফেলতে থাকে, চুষে খায় আমার সব রস। নগর কলকাতা যেন রক্ষাকর্তা পিতার মত, তাঁর মেয়ে সুপ্রীতিকে সরিয়ে নিতে চায় আমার কাছ থেকে। আমি কলকাতায় পা দিলে, নগর ভ্রূকুটি করে, আমার ছায়ায় কালো হ'য়ে ওঠে তার মুখ।

"আর আমাকে একটা ভয় এসে ঘিরে ধরতে থাকে। আমার এ সুখটুকু এক অদৃশ্যচারীর তাড়নায় ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। যেন আমি পরের স্ত্রীকে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়েছি পথে।

"সুপ্রীতির অন্তস্রোতের আবেগ বুক দিয়ে অনুভব করতে হয়। আবেগ তার আছে, আমার পাপের মধ্য দিয়েও তা অনুভব করতে পারলাম। সে যখন স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে, সুখের মধ্যেও মনটাকে মেলে দিচ্ছে একটু একটু করে, সেই সময়ে তার চোখের কোণে চাপা ভীতি ও বিস্ময় দেখা দিল।

"সে বলতে পারে না, কিন্তু আমাকে দেখে অবাক হয়। কখনো বলে, সেখানে কী ভাবে খাওয়া দাওয়া কর, থাক, কিছুই তো বল না।

"আমি বলি, কেমন আবার! ঠাকুরের হাতে খাই, চাকরের পাতা বিছানায় শুই।

"সুপ্রীতি টিপে টিপে হেসে বলে, দেখে কিন্তু মনেই হয় না।

"টিপে হেসে বলে বটে, বিদ্যুতের মত একটি অপ্রতিরোধ্য সংশয়ের ছিলিবিলি খেলে যায় ওর ভ্রূ-লতায়।

"অমনি আমার বুকের মধ্যে বাজে ভীরু হৃৎপিণ্ডের ড্রাম। হেসে জিজ্ঞেস করি, কী মনে হয়? সুপ্রীতি হেসে লজ্জিত হয়ে বলে, যেন কত যত্নে থাক।

"আর ঠিক এ সময়ই ওর মুখটি যেন কী এক অজানা শঙ্কায় শাদা হ'য়ে ওঠে। না জানি আমি কী বলব! কিংবা এ শুধু আমারই চোখের ভ্রম। তাড়াতাড়ি হাসি দিয়ে সব ঢাকি। কিন্তু আমি নিজেই বুঝি, ঐশ্বর্যের অলস আবেষ্টনীর সব ছাপটুকুই পড়েছে আমার শরীরে, চোখে, মুখে।

আমি নিজেও জানিনে, কিন্তু জানে সুপ্রীতি, আমি ওর চোখে চোখ রাখতে পারিনে আর। পাপ রহস্যের যা-কিছু, তা ছিল আমারি চোখে। ও তাকাতো সহজ দৃষ্টিতে ওর নিস্তরঙ্গ চোখের দিগন্তে সূর্যচ্ছটা নিয়ে। আমি উঠতাম চমকে চমকে, চোখাচোখি হলে। ওর সহজ চোখই আমার অসহজ বিভুত ছায়াটি দেখাত যেন আরো স্পষ্ট ভয়াবহ। সেই ভয়ের চমক আমার। জানতাম না, আমার এই চমকটুকু ধরা পড়ে গেছে ওর কাছে। আর যতই চমকাই, ততই আমার কথার সামঞ্জস্য যায় হারিয়ে। আমি এক কথা বলতে গিয়ে আর এক কথা টেনে আনি। কমিউনিটি প্রজেক্টের খালের কথা বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে চলে যাই অন্যপ্রসঙ্গে। নিজের বাসস্থানের কথা বলতে গিয়ে, নিজের অগোচরে এঁকে বসি এক আলস্য-বিলাস

ঐশ্বর্যপূর্ণ আবাসের চিত্র! যার সঙ্গে আমাদের কর্মচারীদের যেন্ জীবনের কোনই মিল নেই।

"আমার অফিসের কাজের সময়ের কথা বলতে গিয়ে ভুলে বলে ফেলি, তখন আমি শুয়ে শুয়ে সুপ্রীতির কাছে আসবার কথা ভাবছিলাম।

"সুপ্রীতি বলে অবাক হয়ে, অফিসে কি শোবার জায়গাও আছে?

"চমকে উঠে অদ্ভুতভাবে মিথ্যে কথা বলি, শোবার জায়গা মানে কি? ওই চেয়ারেই শুয়ে শুয়ে—

"আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই, সুপ্রীতি ব'লে ওঠে, ও! বলেই দ্রুত পায়ে সরে যায় আমার কাছ থেকে। ও যে ভয় পেয়েছে, কাঁপছে ওর বুকের মধ্যে আমার এই এলোমেলো কথায়, সেটুকু ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ও পালায় আমার কাছ থেকে।

"আমি পাগল হ'য়ে ছুটে আসি কাছে, তারপর থমকে যাই—ভয়ে। সুপ্রীতি ওর একলা জীবনে দোকলার পথ চেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে উঠে যখন আমাকে আসতে দেখে, তখনি লুকিয়ে ফেরে ভীরু সংশয়ে।

"সুপ্রীতির রান্নার ফাঁকে একদিন মিঠু জিজ্ঞেস করল, বাবা, তোমাল্ অফিছে আল্ কে আছে?

"আমি ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, আর কেউ নয়, শুধু তুই আর তোর মা।

মিঠুও এই অসম্ভাব্য উক্তি শুনে হি হি করে হেসে উঠল। কিন্তু আমার মন তখন অন্যদিকে চলে গেছে। ওকে দেখতে দেখতে ভয়ে শিউরে উঠে আমি ওকে দুহাতে বুকে নিয়ে বললাম, আমি এ কী করলাম মিঠু, এ কী করলাম।

"হায়, জানতাম না, রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সুপ্রীতি একথা শুনছিল! শুনে ছুটে পালিয়ে গেছে রান্নাঘরে। ওর হাত পা কাঁপছিল।

"কিন্তু আমার চোখও তো কম সজাগ নয়। না-ই বা দেখেছি সুপ্রীতিকে, আমার মন যেন বলে দিল, ও শুনেছে আমার কথা। দেখেছে আমার অসহায় ভীরুভাব। তারপরেই যখন আমি ওকে দেখলাম, কেমন যেন ভয় করতে লাগল। আমি যেচে বললাম, মিঠুকে বলছিলাম, এ কী করলাম আমি।

"যেন কথাটির মধ্যে দুঃখ আছে, পাপ কিংবা ভয় নেই। সুপ্রীতি বলল, কেন ?
"বললাম, এই তোমাদের ছেড়ে বাইরে বাইরে থাকার কথা বলছিলাম। এমন চাকরিই নিলাম।
"সুপ্রীতি একটু হাসল। বুঝলাম না, আমার একথা বলাতে সুপ্রীতি আরো বেশি ভয় পেয়েছে।
"তারপর থেকে সে প্রায়ই আমার বুকের কাছে ঘন হয়ে বলেছে, তোমার যদি খুব কষ্ট হয়, চাকরিটা ছেড়ে দাও।
"সে চাকরি ছাড়বার উপায় ছিল না। তবু বলি, কী করে চলবে দুগ্‌গি আবার তো সেই—
"আর কথা বলতে পারে না সুপ্রীতি। সে যে চাকরী ছাড়ার দুর্গতির কথা ভেবে, তা নয়। এ চাকরির মধ্যে যে আমার কী এক অজানা অধ্যায় আছে জড়িয়ে, সেইটি ভাবতে গিয়ে ও নির্বাক হ'য়ে যায়।
"মীরগাঁ থেকে ছুটে এসেই আমি জিজ্ঞেস করি, কেউ আমাকে খোঁজ করতে এসেছিল কিনা।
"সুপ্রীতি সোজা জবাব না দিয়ে বলে, কেন, কারুর কি আসার কথা ছিল ?
"এই পাল্টা জিজ্ঞাসার সময়ে, আমার যেন মনে হত, কী এক অতল রহস্যে কেঁপে উঠছে ওর ভ্রূ-লতা। চোখের গভীরে অদ্ভুত কৌতুক। যেন, এসেছিল কেউ, জানে ও সবই।
"নিদারুণ ভয়ে আমি উঠি ক্ষেপে। জ্ঞানশূন্য হ'য়ে রূঢ় গলায় ব'লে উঠি, কথা ছিল কি না ছিল, সেটা পরের কথা। কেউ এসেছিল কি না তা-ই বল আগে।
"এই হঠাৎ ক্ষেপামি দেখে ও ভীরু বিস্ময়ে চমকে উঠে বলে, না, কেউ আসেনি। তারপর উদ্‌গত চোখের জল নিয়ে যায় পালিয়ে। আমি ক্ষণিক নিশ্চিন্ত হই বটে, পরমুহূর্তেই আমার রূঢ় ব্যবহারের অনুশোচনায়, আলিঙ্গন ক'রে ক্ষমা চাই সুপ্রীতির কাছে। কিন্তু ও তো আমার রূঢ় ব্যবহারে কাঁদেনি। আমার এই দুর্জ্ঞেয় ব্যবহারের কারণ ভেবে সংশয়ে মরেছে কেঁদে।
"কথায় কথায় হঠাৎ হরিদাসের নাম ক'রে ফেলি। হয়তো চমকে উঠে বলি, আমাকে এখুনি হরিদাসের কাছে যেতে হবে।

"ও অবাক হয়। হরিদাসের কাছে? কেন? যার সঙ্গে আমার জীবনের কোনই যোগাযোগ থাকতে পারে না তার কাছেই আমাকে এমন পাগলের মত ছুটতে হয় কেন? জবাব দিই অস্পষ্ট, গুরুত্ব না দিয়ে হেসে হেসে। ওর মন ওঠে কুঁকড়ে। আমি নিজেকে দিই ধিক্কার।

"সুপ্রীতির সঙ্গে চোখাচোখি হলেই, হাসবার চেষ্টা করি। সুপ্রীতি একদৃষ্টিতে শুধু দেখে। কিন্তু আমার চোখ বদলে গেছে, সে কথা আমি জানতাম না। ব্যথায় অভাবে, আমার যে চোখে কারুণ্য ছিল, আজ সেই চোখের চারপাশে, দিবানিশি ধরা পড়ার ভীরু চিন্তায় মাকড়সার জালের মত ছাপ পড়েছে। সেই কালো পরিখার মাঝখানে আমার দুই চোখে শুধু ভীরু অনুসন্ধিৎসার তীব্রতা ও ধ্বকধ্বকানি এক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে।

"কতদিন কত সময় দেয়ালে টাঙানো, আমার, সুপ্রীতির আর মিঠুর ছবিটার দিকে চোখ পড়ে, আড়ালে থমকে গেছি। যেন অনেক বাধা ঠেলে ছুটে গেছি ছবিটার কাছে।

"জানতাম না, এ ঘরে যার ছায়ায় ছায়ায় আমি ফিরছি, সে দেখছে এসব।

"এমনি করেই আমার জীবনের আপ-ডাউনের পিস্টন্ রডটায় ক্ষয় ধরছিল। হাওড়া থেকে মীরগাঁগামী আপ-ডাউন গাড়ির এঞ্জিনের পিস্টনটির মত! কিন্তু এঞ্জিনের পিস্টনে তেলহীন ভয় বিদ্রোহের অমসৃণতা ছিল না। আমার প্রতিমুহূর্তেই আটকে ভেঙ্গে পড়ার ভয়। আর এই গোটা মেশিনটিকে ভাঙ্গবার জন্যে উদ্যত হয়েছিল স্বয়ং হরিদাস। নির্দেশ ছিল হরিদাসের, কলকাতায় এলে, তার বাড়িতে দেখা করি বা না করি, নিবারণের দোকানে সাক্ষাৎ করতে হবে।

"আমার পক্ষে সেইটিই ছিল সুবিধের। কেননা, বীণাদির কাছে যেতে আমার পা ওঠে না। ওঁর সামনে গেলেই আমি অন্যরকম হ'য়ে যাই! আমি যে-নিঃশ্বাসটুকুও আমার নরকের মধ্যে নিতে পারি, ওখানে গেলে সেটুকু আসে রুদ্ধ হ'য়ে। তা' ছাড়া বীণাদি'র কাছে গোপন নেই কিছুই। নেই বলেই আমি তাকাতে পারিনে চোখ তুলে।

"মীরগাঁয়ের লোকেরা এসেছে কয়েকবার বীণাদি'র বাড়িতে। তাদের সঙ্গে বীণাদি'র কপট ব্যবহারের মধ্যে একটুও খুঁত খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেন সত্যি কাকীমা। কিন্তু ওঁর চোখ মুখ গেছে বদলে। ওই মুখে অন্ধকার ছিল অনেকদিন ধরেই। সেই অন্ধকারের মধ্যে একটি বেদনা বিষণ্ণতা ছিল ঘিরে। এখন বীণাদি'র চোখ দুটি সহসা অনেক বড় হ'য়ে উঠেছে। প্রদীপ্ত সেই চোখের মধ্যে কী এক ভয়াবহ প্রশ্ন যেন নিয়ত জিজ্ঞাসু। চেহারা শীর্ণ হ'চ্ছে ক্রমেই। কথা বলা প্রায় বন্ধ করেছেন। আমি বুঝতে পেরেছি, বীণাদি, আঁস্তাকুড়ের জঙ্গলের আগুনে, কোথা থেকে নিক্ষিপ্ত এক টুকরা ধূপের মত পুড়ে পুড়ে নিঃশেষে ক্ষয় করছেন নিজেকে। স্বামীর জন্য সব অপমানই এতদিন সহ্য করেছেন, ছেড়ে এসেছেন আত্মীয়স্বজন। ভুলে থাকতে চেয়েছেন সবাইকে একজনের জন্যে। কিন্তু হরিদাসের কোন পাপের মধ্যে হারিয়ে ফেলেননি নিজেকে। এবার মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে একাত্ম হয়েছেন।

"বীণাদি'র সামনে গেলে, ওঁর ওই প্রদীপ্ত চোখ যেন আমার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে কেবলি বলে আমাকে, আমার এই সন্তানগুলোকে হত্যা করলে তুমি!

"সেখানে যাওয়া যায় না। পালানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না আমার। সেদিক থেকে হরিদাস আমাকে রেহাই দিয়েছিল বটে। কিন্তু একমাস না যেতেই নিবারণের দোকানে সে আমার কাছে দাবী ক'রে বসল আরো তিন হাজার টাকা।

"সভয়ে চকিতে ফিরে তাকাতেই দেখি হরিদাস হাসছে নিষ্ঠুর ভাবে। যেন কলে আটকানো ইঁদুরটার দিকে দেখছে কেউ। কী ভয়ঙ্কর! এই হরিদাসের গালে আমি আঘাত করতে সাহস করেছিলাম! কোথায় আমার সেই দীপ্ত ক্রোধ, যা দিয়ে সমূলে বিনাশ করা যায় তাকে।

"যায় না, আর যায় না। মানুষের বেশে এমন পুতুল হয়েছি। আমার খেলা এখন আর আমার হাতে নেই।

"জানতাম হরিদাস তার নিজের জীবনে অনেক সর্বনাশ করেই বসে আছে। দেশের বাড়িটি সে লুকিয়ে বিক্রী করেছে তিন জনের কাছে। তাদের কাছে সময় চেয়েছে টাকা শোধ করবে ব'লে। তা' ছাড়া, হ্যাণ্ডনোট দেনাও কম

করেনি। তার নিজের চক্রের মধ্যেই অনেক শত্রু তৈরী করেছে সে। তার এই আসন্ন বিনাশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে, জীবনের দাবা-খেলায় আমাকেই সে মোক্ষম ঘুঁটি হিসেবে দিয়েছে চাল। আমি তার শেষ ভরসা। আমাকে সে ছাড়বে না কোনমতেই, আমার মুক্তি নেই তার হাতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি অন্যের হাতে যাই। যে মৃত্যুর হাত আমারই আশেপাশে ফিরছে অষ্টপ্রহর।

"আমি তিন হাজার দিয়েছি। এমন দফায় দফায়, চার দফে দশ হাজার টাকা নিয়েছে সে আমার কাছ থেকে। তাতে মুক্তি আমার আসন্ন হয়নি। হরিদাসেরও পন্থা অন্যরকম। নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা সে করেনি। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে ঢেলে দিয়েছে অন্যপথে। হতাশ হ'য়ে আরো ভয়ঙ্কর হ'য়ে ছুটে এসেছে আমার কাছে। ওদিকে মীরগাঁয়েও দেখা দিয়েছে বিস্মিত সংশয়। আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছি জালে।

"আমি যতই আমার পা দুটিকে টেনে রেখেছি, ততই আমার রুদ্ধশ্বাস ভয় আমাকে ঠেলে নিয়ে গেছে হরিদাসের কাছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে আর কথা বলতে পারিনে। সে বলে নির্বিকার নিষ্ঠুর গলায়, পরের সপ্তাহে আমাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে নিখিল।

"শুনি আর আমার পায়ের তলায় মাটি কাঁপতে থাকে। নিঃসাড়ে আমার দুই হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পাপ করেও আমি ভীরু। হরিদাসকে হত্যা করার সাহসও আমার নেই। বলি, কী বলছ তুমি হরিদাস?

"ঠিকই বলছি। নিজের জীবন বাজী রেখে নেমেছি। সে কি তোর একলা ভোগের জন্য? আমার প্রাপ্য আমার চাই। তা' ছাড়া তোর বীণাদি'কে পর্যন্ত তোর কাজে লাগিয়েছি, মজুরি দিবিনে?

"হরিদাসের মুখে থাকে মদের গন্ধ। আমার হাত তার গালের কাছে উঠেও নেমে আসে। বলি, যদি না দিই হরিদাস? মীরগাঁয়ে গিয়ে বলে দেবে, এই তো?

"হরিদাস হিংস্র হেসে বলে, আজ্ঞে না।

"তবে?

"বলব সুপ্রীতিকে।

"আমি সভয়ে মুখ ঢাকি। আমার সব ভয়, সব আনন্দ, সব ব্যথা, যন্ত্রণা, আমার সব সুখ যার কাছে, তাকে আগে মারতে চায় হরিদাস। হরিদাস আমাকে ঠিক চিনেছে।

"তবুও অনুনয় বিনয় করি, হরিদাস, মীরগাঁয়ে আমি ধরা পড়ে যাব।

"হরিদাস অবিশ্বাসে হাসে। বলে, তোর শ্বশুর গেছে বৃন্দাবনে। সর্বময় কর্তা হলি তুই। যা বলবি তাই হবে। তুই আটকালে, ও মেয়েটাই তো আছে তোর সহায়। সে তোকে যুগিয়ে দেবে সবকিছু।

"হরিদাস নিজেকে দিয়ে বিচার করা ছাড়া আর কিছু জানে না। সে আমাকে বিশ্বাস করবে কী ক'রে?

"কিন্তু মীরগাঁয়ে অস্বস্তি সত্যিই দেখা দিয়েছে। নীলু গোমস্তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে শিরশির করে। ধান-চালের হিসেবি সর্পিল কপালে তার কুটিল সন্দেহ কিল্‌বিল্ করে।

"তারপর দশ হাজার চৌদ্দ হাজারে দাঁড়াল ছ'মাসের মধ্যে।

"চৌদ্দহাজার টাকাটা মাধববাবুর পুঁজির মধ্যে এমন কিছুই নয়। কিন্তু আমার হাত দিয়ে গড়পড়তা প্রতি মাসে প্রায় আড়াই হাজার টাকা নেওয়াটা একটা ভয়ঙ্কর কিছু, তাতে সন্দেহ নেই। হরেন এবং নীলু গোমস্তাকে আমার প্রয়োজন মেটাতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন মাধববাবু। কিন্তু তিনিও নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেননি, আমার প্রয়োজনের দৌড় কতখানি হতে পারে। নীলু আর হরেনের সন্দেহ ক্রমে ওদের আড়ষ্ট করে দিচ্ছে। আগে ওরা দুজন আমার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলত। এখন আমাকে দেখলেই, পরস্পর চোখাচোখি করে। ছলনা করে আমার সঙ্গে, যেন আমাকে দেখতেই পায়নি। আমিও বাইরের বাড়ির দরজায় এসে নিজেকেই নিজে ঠেলতে থাকি। আমার পদযুগল কিছুতেই চৌকাঠ মাড়াতে চায় না। টাকাটা চাওয়ার আগে আমাকে যে পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয় নিজের সঙ্গে, তার চেয়ে বোধহয় নিজের গলা টিপে নিকেশ করা অনেক সহজ ছিল। কিন্তু তা' আমি পারিনে।

"আজ্ঞে? টাকা চাইছেন?—কী এক অদ্ভুত সুরে জিজ্ঞেস করে নীলু। আমার অন্তরাত্মা ওঠে কেঁপে। ভয় হয়, এখুনি বুঝি জিজ্ঞেস করে বসবে,

কেন বলুন তো? কী করছেন এত টাকা দিয়ে? এত টাকা তো আর দিতে পারব না।

"কিন্তু ওরা কিছুই বলে না। বলে, কত টাকা? হু' হা-জা-র! আচ্ছা, আপনি যান, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

"আমার আড়ালে নীলু বলে. কেমন বুঝছ হরেনদা?

"বুঝব আর কী। খাল কেটে, লেখাপড়া জানা কুমীর ঢুকিয়েছেন কর্তা।

"কিন্তু বড় গভীর জলের।

হুঁ, নইলে, কিছুই কি আর ধরা যেত না?

"জানি, কত দ্রুত আমি আমার পাতালের অন্ধকার স্রোতের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছি তরতর করে। উন্মুক্ত আকাশের তলায়, প্রকাণ্ড মোহনার ঘূর্ণীতে গিয়ে পড়তে হবে আমাকে শীঘ্রই।

"ছ'মাস! ছ'টি মাস আমার কাছে ছ'টি নারকীয় যুগ। সদাশঙ্কিত এ অবস্থায় আমি আর চলতে পারছিনে।

"এর সঙ্গে আরো দুটি ভয়াবহ উপসর্গের কথা বলি। একদিন হঠাৎ নিবারণ মীরগাঁয়ের বাড়িতে এসে হাজির, নতুন জামাইবাবুকে দেখতে আসার অছিলায়। সে এসে আমার সামনে দাঁড়াতেই চমকে উঠলাম। সে বলল, পেন্নাম হই জামাইবাবু। আমার নাম নিবারণ ঘোষ, মীরগাঁয়েই বাড়ি।

"তারপর স্বর নামিয়ে বলল, ঘটকালির প্রথম কাজ আমার। হরিদাসবাবু আমাকে বড় ঠকাচ্ছে।

"আমি সভয়ে পেছিয়ে এলাম। হঠাৎ আঘাতে রক্তহীন মনে হল আমাকে। মনে হল, তখনি মাটিতে পড়ব মুখ থুবড়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই দাঁড়ালাম সোজা হয়ে। হঠাৎ এক ষড়যন্ত্র প্রকাশ হ'য়ে পড়ায় পরিবেশ ভুলে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলাম। উদ্যত হলাম নিবারণকে আঘাত করতে। সেই নিমেষেই দেখলাম, নীলু গোমস্তা দাঁড়িয়ে আছে বারবাড়ির বারান্দায়। ঘটনা বারবাড়ির উঠোনে। বললাম, আচ্ছা যাও। হরিদাসকে আমি বলব।

"কিন্তু নিবারণ আজ আর ভয় পাওয়ার পাত্র নয়। বলল, না বাবু, ও সয়তানকে বললে কিছুই হবেনা। আমার পাওনাটা আপনিই দেবেন। মীরগাঁয়ে আমার বাড়ি, কলকাতার বউদিদিমণিকেও আমি চিনি।

"ততক্ষণে নীলু কাছে এসে পড়েছে। বলল, কী রে নিবারণ, কী বলছিস্?

"নিবারণ নীলুকে নমস্কার করে বলল, এই জামাইবাবুকে বলছিলুম যে আমিও কলকাতাতেই চায়ের দোকান করিচি। কলকাতায় গেলে মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেবেন।

"নীলু বিদ্রূপ ক'রে বলল, হ্যাঁ, জামাইবাবুর তো কলকাতায় গিয়ে আর কাজ নেই। তোর ওই ছাতা-পড়া চায়ের দোকানে পায়ের ধুলো দিতে যাবেন।

"নিবারণ বলল, যাবেন গো গোমস্তামশাই, যাবেন। গরীব মানুষ, পায়ের ধুলো চেয়েছি যখন, দেবেনই। ওটা বড়মানুষের ধম্মো। হেঁ হেঁ হেঁ...

"নীলু টের পেলনা, কিন্তু আমি বুঝলাম, নিবারণ কোন্ পায়ের ধুলোর কথা বলছে, আর কী তার কথার অর্থ।

"নিবারণ বলল আবার, আচ্ছা, চলি জামাইবাবু, চ'ল গোমস্তামশাই।

"হরিদাস যখন আমার মুখে শুনল সব, দেখলাম, তার চোখে আগুন। অতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ভাবে খালি বলল, ব্যাটাকে সরাতে হবে।

"আমি শিউরে উঠলাম। হরিদাস বলল, ভাগীদার যত কমে, ততই ভাল।

"আমি সাবধান করলাম নিবারণকে। সে হরিদাসকে বোধহয় সঠিকরূপে চিনত। সেই জন্য তার ভয়ও নিরর্থক ছিল না। কলকাতা থেকে একেবারে গা ঢাকা দিয়ে মীরগাঁয়ে গিয়ে বসল। কিন্তু তার একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখলাম। সে আমাকে 'পাওনার' জন্য আর উত্যক্ত না করে ভক্তি করতে আরম্ভ করল। বরং আমাকেই বলল, বাবু, আপনার মত মানুষ হরিদাসের বন্ধু হয় কী করি জানিনে। আগে জানলে, আমি কিছুতেই এমনটি হতে দিতুম না। ও সবই করতে পারে।

"আর একটি উপসর্গ আরো ভয়ঙ্কর। একদিন দোতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম, একটি চাষী-দম্পতি উঠোনে ঢুকেছে। অন্নপূর্ণা বললেন, কী রে নন্দ, বে' করে বউ দেখাতে এনেছিস?

„আজ্ঞে।

"অন্নপূর্ণা বললেন, দেখি কেমন বউ?

বলে সামনে এলেন অন্নপূর্ণা। তিনি ছোঁবেননা। একটি ঝি এসে বউয়ের ঘোমটা খুলে ধরল। আমি সভয়ে সরে এলাম। দেখলাম চাঁপা।

"নন্দলাল বলল, বুইলেন পিসিমা, কলকেতার মেয়ে বে' করেছি।

"পিসিমা বললেন, বেশ করেছিস্।

"নন্দলাল বলল, একবার লতুন জামাইবাবু আর দিদিকে দেখব যে?

"পিসিমা : ওপরে যা, আছে ওরা।

"আমার সামনেই দোতলার বারান্দায় বসে আছে মালতী। সামনের সিঁড়ি দিয়ে গেলে চাঁপার মুখোমুখি পড়ে যাব। মালতী যাতে টের না পায়, পা টিপে টিপে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। পেছনের বারান্দার দরজা নিঃশব্দে খুলে, বাগানের দিকে নেমে যাওয়ার সিঁড়িতে পা দিলাম। এ সিঁড়ির দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। খুলতেই ইঁদুর-[illegible]কের সুখের রাজত্বে একটি লণ্ডভণ্ড সুরু হ'য়ে গেল। আর কী অন্ধকার! শুনতে পাচ্ছি, ওরা ততক্ষণে ওপরে এসে পড়েছে। মালতী বলছে, নেই? এখানেই তো ছিলেন। ত্যাখ তো ঘরের মধ্যে নাকি?……নেই? তাই তো, এইমাত্র ছিলেন যে। পায়ের শব্দও তো পেলুম এখুনি ঘরের মধ্যে। ত্যাখ তো পেছনের বারান্দায়।

"নন্দ : নেই গো দিদি।

"মালতী : আশ্চর্য।

"আমি ততক্ষণে নিঃশব্দে বাগানে এসে পড়েছি। বাগান থেকে একেবারে ঘুরে, উত্তরের গোলাবাড়িতে।

"অনেকক্ষণ পর যখন ফিরে এলাম, মালতী অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কখন বেরিয়েছিলে?

"কেন বল তো? অনেকক্ষণ হবে।

"অনেকক্ষণ? মালতীর নীল অন্ধ চোখ দুটি তিরতির ক'রে কাঁপতে লাগল। —আশ্চর্য! আমাদের এক কিষেণ নন্দ এসেছিল তার বউ নিয়ে, তোমাকে নমস্কার করতে।

"আমি স্বাভাবিক অবজ্ঞা ভরে বললাম, ও!

"কিন্তু অস্বাভাবিক বিস্ময়ে কেমন যেন জিজ্ঞাসু নির্বাক হ'য়ে রইল মালতী।

"কে জানত চাঁপাও আসবে এখানে। যেন, সমস্ত ঘটনাটি একটি ছক বাঁধা উপন্যাসের মত।

"আমি শুধু মালতীর কাছে জেনে নিলাম, ওই চাষী-দম্পতির বাড়ি পাশের গ্রাম নিধুপুরে।

"কিন্তু মালতীর সেই নির্বাক জিজ্ঞাসা তো কাটল না। ওর ভয় বাড়ছে ক্রমেই। কাছে এলে, কী যেন জিজ্ঞেস করতে চায় খালি মালতী। আর আমি জালে আটকাপড়া মৃত্যু-ভীত পতঙ্গটির মত ছটফট করছি। কোথায় পাওয়া যায় একটুখানি ফাঁক। এ জালের বুনোনিতে কোথাও কি একটু খুঁত নেই, একটু ছিন্ন অংশও নেই, যেখান দিয়ে, এ জীবনে আর একবারের জন্য আমার স্বস্তির নির্মেঘ আকাশটুকু দেখে নিতে পারি। জীবনে আর একবার, শেষবার প্রাণভরে পারি নিঃশ্বাস নিতে।

"তুমি হয়তো তোমার আধুনিক মন নিয়ে, আমার এই আকুতিতে তৃপ্তিবোধ করছ। ভাবছ, ঠিক হয়েছে, এই তো নিখিলেশ গাঙ্গুলির নিজেরই তৈরী উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ পরিণতি ছাড়া তার আর কী হতে পারত।

"হয়তো ঠিকই ভাবছ। এই পরিবেশ থেকে যখন মনকে একটু আলাদা করে নিতে পারি, (এখনো পারি ?) তখন আমারো যুক্তির মধ্যে ওকথা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

"কিন্তু জীবন তো সরলরেখা নয়। মানুষ একবার বাঁচতে চায়। মানুষের মনের আর যা ঘোর প্যাঁচ থাকুক, ওখানটিতে কোন ফাঁক নেই। যখন কোন বিষাক্ত হিংস্র পশুকে আমরা দাপিয়ে মরতে দেখি, শত্রুকে মরতে দেখি ছটফট ক'রে, তখন উৎফুল্ল হই। মৃত্যু যন্ত্রণার কোন স্পর্শে আমাদের মনে থাকে না।

"আমার যন্ত্রণা কাউকে স্পর্শ করবে না জানি। তবু আমি ফাঁক না খুঁজে তো পারিনে। যেখানে যাই, সেখানেই একটু ফাঁক খুঁজে বেড়াই। কলকাতার পার্কে, সিনেমায়, থিয়েটারে, মীরগাঁয়ের বাগানে, ছাতে, মাঠে, ঘাটে, দিগন্তব্যাপী আকাশের সীমানায়। কোথাও পাইনে সেই ছিন্ন অংশ।

"সেদিনও মালতী ডেকে নিয়ে গেল ছাদে। কিন্তু দিগ্‌বিসারী সেই গ্রামের শোভা আমি ভোগ করতে পারিনে।

"বেলা গেছে। নতুন শরতের আবির্ভাব ঘটেছে বনে বনে আকাশে। এখানে আকাশ এত বড়, এত বিশাল যে দু' চোখে কোথাও তার শেষ পাওয়া যায় না। এই তেতালার ছাদের বুকে নেমে আসে যেন টুকরো টুকরো মেঘ। বর্ষায় বন বাদাড় গাছপালা, সবই যেন একটু বেশী প্রাণের বন্যায় বন্য হয়ে উঠছে। শরতের আবির্ভাবে তার গাঢ় সবুজে কেমন একটি স্নিগ্ধতার প্রলেপ লেগেছে।

"কিন্তু এসব আমি কিছুই দেখছিলাম না যেন। আমার মনে সেই একই ভরসা একই চিন্তা আর সবকিছুই দূর ক'রে দিয়েছে চিরদিনের জন্য। না এসে পারিনে, যখন বারবারই মালতী বলতে থাকে, ছাতে যাবে একটু?

"ও কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু ওর যে-প্রাণ অনেক ভয় সংশয় নিয়ে আবদ্ধ হয়ে আছে, তাকে এই নিরালা ছাদের মুক্ত আকাশের তলায় নিয়ে এসে একটু বাতাস লাগতে চায়। আরো গভীরে যদি ভাবা যায়, তা'হলে হয়তো মালতীর মনের আর একটি দরজার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আমার নিষ্ঠুর মৌনতা, দূরে দূরে থাকা যদি হঠাৎ এইখানে বাঙ্‌-মুখর হয়ে ওঠে। যদি সব দূরত্ব ঘুচে নৈকট্য আসে ঘন হ'য়ে। আকাশে বাতাসে যে অদৃশ্য প্রাণ আছে, সে তো দেখতে পায়, ছাদে এসে মালতীর নিঃশ্বাস হয়ে উঠেছে ঘন ঘন। শুনতে পায়, ওর বুকে প্রতীক্ষার পল গুণছে ধুক্‌ধুক্‌ ক'রে। কে যেন ব্যাকুল সুরে গাইছে ওর প্রাণের অন্ধকার থেকে,

এ অন্ধকার ঘুচাও তোমার
অতল অন্ধকারে, ওহে অন্ধকারের স্বামী।

"কিন্তু আমি তো আজ তা দেখছিলাম। আমি দেখছিলাম আমার ভয়ঙ্কর চক্রান্তদীপ্ত চোখে এই আলসেহীন তেতলা ছাদ। দেখছিলাম, আমি দাঁড়িয়ে আছি ছাদের একপ্রান্তে, আর মালতী চিলকোঠার দেয়ালের কাছে। সেখান থেকে ও পায়ে পায়ে অগ্রসর হ'চ্ছে। সংশয়ে হাসতে হাসতে বলছে, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করব?

"আমি নীরব, তীক্ষ্ণ চোখে খালি তাকিয়ে আছি ওর আলতাপরা পা দুটির দিকে। ও বলতে বলতে অগ্রসর হ'চ্ছে ছাদের আর এক প্রান্তে। ভেবেছে, আমি ওইদিকে আছি। আমার কথার জবাব না পেয়ে, জিজ্ঞেস করছে, শোন, ? তুমি কোথায় ? একটি কথা বলব ?

"আমি দাঁতে দাঁত চেপে নীরব। দেখছি, ও পায়ে পায়ে কেবল ছাদের প্রান্তে যাচ্ছে এগিয়ে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, বর্ষা শেষের এই পিছল ছাদ, আর ছাদের শেষে বহু নীচের কঠিন মাটি। যাক্, যাক্ এগিয়ে মালতী। আমি সমস্ত স্নায়ু শক্ত ক'রে আছি দাঁড়িয়ে, হঠাৎ একটি তীব্র চীৎকার শুনতে পাব, আর শুনতে পাব তেতলার নীচে একটি ভারী জিনিস পতনের শব্দ।

"মালতী এগুচ্ছে। আমার নিঃশ্বাস বইছে ঘন ঘন। ঘাম ছুটছে বিন্‌বিন্ ক'রে। যাক্ যাক্। পেয়েছি এতদিনে পেয়েছি, জালের সেই ছিন্ন অংশটি। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই মীরগাঁয়ের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাব আমি।

"শোন, তুমি কোথায় ?

"যাক্, আর একটু ! আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, কালা হ'য়ে যাচ্ছি কাণে। কিছুই শুনতে পাচ্ছিনে। নিজের মুখ নিজেই চেপে আছি। দেখছি, আকাশটা ক্রমে ঘন হ'য়ে আসছে। তেতলার ছাদটি উঁচু হয়ে উঠছে আরো। নীলশাড়ি পরা একটি মূর্তি এগিয়ে চলেছে অতল খাদের ধারে। ঘোমটা খসে গেছে, বিকেলে বাঁধা খোঁপায় চিক্‌চিক্ করছে সোনার কাঁটা ! যাক্, যাক্ ! অস্থির হ'য়ে উঠছি, কাণে আসবে এখুনি চীৎকার ও পতনের শব্দ। এই ছুঁল বুঝি শূন্য আকাশ।

"ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ বাতাসের সেই অদৃশ্য প্রাণ, জোর ক'রে আমার গলা দিয়ে উঠল চীৎকার ক'রে, যেও না, থামো, আর যেও না।

"কী ঘটে গেল কে জানে। কয়েক মুহূর্ত অন্ধ হ'য়ে রইলাম কিসের ঘোরে। ঘোর কাটতে দেখলাম, মালতী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দূরের কার্ণিশ ঘেঁষে। ওরও যেন ঘোর লেগেছিল। সারা মুখে ও দৃষ্টিহীন চোখে ভয়—বিস্ময়।

"বলল, তুমি কোথায় গো ?

"বললাম, এই যে, এখানে।

"এত যে ডাকলুম তোমায় ? শুনতে পেলে না ?

"সব সময়ে নীরব থাকার সুযোগ নিয়ে বললাম, খেয়াল করিনি তো।

'আমার কথার স্বর-পথ ধরে এগিয়ে এল। কিন্তু, কেন জানিনে, আমার এই পাপ প্রাণের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ ফেঁপে ফুলে চৌচির হয়ে ফেটে পড়বার উপক্রম করল! চোখ ফেটে এল জল।

"যে আমার ভিতর থেকে চীৎকার করে উঠেছিল, তার বিরুদ্ধে নিরুদ্ধ ক্রোধ-ই বোধহয় চোখের এই জল।

"তারপর কতদিন বিনিদ্র রাতের, এক অদৃশ্য প্রেতের তাড়নায়, এগিয়ে গিয়েছি ঘুমন্ত মালতীর দিকে। কাঁকড়ার দাঁড়ার মত শাঁড়াসী-শক্ত থাবা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি ওর সোনার হার লতানো গলার কাছে। দীপ্ত চোখে ঝুঁকে পড়েছি ওর দিকে।

'যতই ঝুঁকে পড়েছি, দেখেছি, অন্ধ চোখ হঠাৎ তরল অথচ গভীর টানা চোখের চকিতে দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। সে দৃষ্টিতে বিস্ময় ও বেদনা। সে চোখ সুপ্রীতির। আমাকে সে এই শেষ মুহূর্তের দরজা থেকে বারবার ডেকে নিয়ে যায় ফিরিয়ে।

"আমার ভয়, সুপ্রীতির ভয়, মালতীর ভয়, বীণাদি'র ভয়, এমন কি হরিদাসেরও ভয়। ভয়েরই ভয়াল রাজত্ব চারদিকে।

"সুপ্রীতির চোখের সংশয় ও বিস্ময় আস্তে আস্তে ভয়ে রূপান্তরিত হল। সিনেমায় গিয়ে, বেড়াতে গিয়ে, আমি হঠাৎ ওকে বাড়ি নিয়ে চলে আসি। ও প্রতিবাদ করবার অবসরটুকু পর্যন্ত পায় না। যেন আমাকে কেউ তাড়া করেছে হঠাৎ। হয় ট্যাক্সি ডাকি নয়তো কোন প্রায় চলন্ত বাসে ট্রামে উঠে পড়ি। সুপ্রীতি ভয়ে, দিশেহারা গতিতে মিঠুকে নিয়ে অনুসরণ করে আমাকে। মিঠুটাও অবাক হয়।

"সুপ্রীতি বলে, কী হল ? চলে এলে যে ?

"আমি বলি, এই ভাল দুগ্‌গি। বাইরে থেকে এসে আর তোমাকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে ভাল লাগে না।

"কিন্তু চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে তুহিন শীতে যেন আমার বুক কেঁপে ওঠে। তখন পালাবার জন্যে ছটফট করে উঠি।

"কিছুতেই তাকিয়েই থাকতে পারিনে সুপ্রীতির দিকে। বাথরুমে পালিয়ে যাই, নয়তো হাঁপাতে হাঁপাতে শুয়ে পড়ি।

"সুপ্রীতি বলে, তা' বেশ তো! ঘরেই না হয় গল্প করব দুজনে। কিন্তু তুমি এমন করছ কেন।

"সেই মুহূর্তেই সম্বিৎ ফিরে পাই। হেসে বলি, কই, কী রকম করছি।

"বুঝতে পারি, আমার ছলনা দেখে সুপ্রীতির চোখ ফেটে জল আসছে। সেটুকু চেপে বলে, কী জানি, কেমন যেন অস্থির, অস্বাভাবিক মনে হয় তোমাকে।

"আমি জোরে হেসে উঠে বলি, ওটা তোমার মনের ভুল।

"কিন্তু ভুল দিয়ে ভুলকে চেপে রাখা যায় না। সুপ্রীতির কাছে আমার এই অস্পষ্টতা যে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। ও দুগ্‌গি, আমি ওর সবচেয়ে বেশী কাছের মানুষ, সবচেয়ে বেশী চেনা। আমাকে চিনতে ও ভুল করবে কেন।

"কিন্তু সুপ্রীতি তো অবলা জীব নয়। ভয়েও চীৎকার করবে না, অস্থির হবে না, খালিখালি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করবে না কাণের কাছে। ওর মনে থাকে ভয়, মুখে হেসে ঠিক সব ভয়ে টান টান তন্ত্রীটিতে কাঁপিয়ে দেয় ঝঙ্কারে। যেখানটা ওর অগোচরে রয়েছে, সেইখানটির সম্পর্কে বলে, একবার নিয়ে চল না তোমার চাকরির জায়গায়।

"আমি চমকে উঠে বলি, কেন?

"ও বলে, এমনি। একবার দেখে আসি, সেখানে কেমন থাকো।

"মুখ অবিকৃত রেখে বলি আমি, কেমন আবার! বলেছি তো মরু-নির্বাসন। প্রতিমুহূর্তে এখানে তোমার কল্পনাতেই কেটে যায় সময়।

"সুপ্রীতি একটু উচ্ছ্বাসের ভঙ্গিতেই বলে, তাতে কী। থাকব না তো। গিয়ে তো ঘুরে আসা যায় একদিনেই।

"আমার চীৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে করে, না, না। কিন্তু তাতে ধরা পড়াটাই সহজ হ'য়ে উঠছে। বুঝতে পারি, এখানে সোজাসুজি 'না' বলে উড়িয়ে দেওয়াটাই জাগ্রত করবে সন্দেহকে। বলি, আচ্ছা, যেও। আর কিছুদিন যাক্।

"কিন্তু এতেই সব শেষ হয় না। যখন মিঠু ঘুমিয়ে পড়ে, রাত্রের নিরালা সুপ্তিতে যখন মুখোমুখি হই দুজন, তখন বুকের কাছে ঘন হ'য়ে বলে সুপ্রীতি, আমার বড় ভয় করে।

"আমি বলি, কিসের ভয়।

"সুপ্রীতি : কি জানি।

"তারপর সুপ্রীতির ঠোঁটের কোণে সেই বৈরাগিনীর হাসিটুকু বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। বলে, অভাবকে বড় ভয় করি। কিন্তু তোমার ভয় বুকে রেখে বাঁচব কেমন করে?

"আমার কিসের ভয়।

"সুপ্রতি বলে, তোমার জীবনের, তোমার মনের, তোমার সবকিছুর।

"আমি ভেতর থেকে জোর করে বলি, আমার জীবন, মন, কোন কিছুরই ভয় নেই সুপ্রীতি।

"কিন্তু আসল সত্যকে তো গোপন রাখা যায় না। ছাই চাপা দিয়ে তো রাখা যায় না আগুন। যে দু' একটি রাত এসে কলকাতায় আমরা স্বর্গাবাসে কাটিয়ে যাই, সেখানেও পাশে পাশে আসে আমার প্রেতলোকের বিনিদ্র দুঃস্বপ্নরা। ঘুমন্ত সুপ্রীতি আর মিঠুকে দেখি। তার সেই অদৃশ্যের প্রেতটা তাড়না করে আমাকে। সে বলে, এই তো, আর একটি ফাঁক তোর বেড়াজালের। এই অংশটি ছিঁড়ে ফেলতে পারলে আর কোন ভয়ই থাকবে না।

"তখন সেই প্রেতটাকে তাড়াবার জন্যে ছুটে যাই বন্ধ জানালায়। খুলে দিই আগল।

"জানিনে, আমার এই নিঃশব্দ দুঃস্বপ্ন ক্রীড়া সবই সভয়ে দেখছে সুপ্রীতি। তার-পর আমাকে ঘুমন্ত পেয়ে লুটিয়ে পড়ে আমার উপর। দেখে আমার মুখের প্রতিটি রেখা। ভয়ে ও বেদনায়, শিশুর মত হাত বুলোয় আমার মুখে মাথায়।

"সুপ্রীতি টের পায়, আমি ওর ছায়াও অজান্তে দেখলে চমকে উঠি। ডাক শুনে থমকে যাই।

"একদিন দুপুরে দুজনে রয়েছি ভিতরের ঘরে। কড়া নড়ে উঠল বাইরের ঘরের দরজায়। চমকে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলাম, কে?

"সুপ্রীতি আমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বলল, হয়তো কেউ এসেছে।

"কিন্তু আমার কাছে তো বড় একটা কারুর যাওয়া আসা নাই। ভয়ে কী রকম শাদা হ'য়ে উঠতে লাগলাম আমি। সুপ্রীতি ভেবেছিল আমি-ই যাব দরজা খুলতে। কিন্তু আমার মুখ দেখে আতঙ্কিত হল ও। বলল, আমি যাব?

"আমি সংশয়াম্বিত স্বরে বললাম, যাবে? আচ্ছা যাও। যদি আমাকে চায়, নাম জিজ্ঞেস কর।

"ভাবতেও পারছিনে যে, সুপ্রীতির বিস্ময় যত বাড়ছে, ভয় ততই ছাড়িয়ে যাচ্ছে সীমা।

"ও তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলল। একটি মোটা গলা শোনা গেল, এখানে, নিখিলেশ মানে নিখিলেশ গাঙ্গুলি থাকেন তো?

"আমি ভিতরের ঘর থেকে অপরিচিত গলা শুনে আরো ভয় পেলাম। পরমুহূর্তেই সুপ্রীতির তরল-হাসি গলা পেলাম শুনতে, হ্যাঁ মশায় হ্যাঁ। কী চেহারা করেছ। একেবারে যে চেনা যায় না।

"এবারে মোটা গলার হাসি। তারপর, যেভাবে এসে দাঁড়ালে তুমি, আর যেভাবে তাকালে, ভাবলুম বুঝি ভুলেই গেছ এই সহপাঠীকে। কই, শ্রীমান কোথায়। শুনেছি আজকাল খুব বড় চাকরি করছে, ভুলেই গেছে আমাদের।

"ততক্ষণে আমিও উঁকি মেরেছি। আমার আর সুপ্রীতির পুরনো বন্ধু অতনু।

"দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, এই যে, এসো।

"সুপ্রীতি হেসে উঠে বলল, বস।

"অতনু যখন গল্প করে চলে গেল, তখন সুপ্রীতির দিকে তাকিয়ে দেখি, ও একদৃষ্টে তাকিয়ে আমার দিকে। বললাম, কী হয়েছে ডুগ্‌গি?

"আমার কিছু হয়নি। তোমার কী হয়েছে, তাই ভাবছি। অতনু আসাতে তুমি অত ভয় পেলে কেন!

"ভয় তো পাইনি, চমকে উঠেছিলাম। ভাবলাম, কে না কে এসেছে।

"সুপ্রীতির চোখে সংশয়। বলল, যে-কেউ-ই-হোক্, কাকে তোমার এত ভয়?

"বললাম কাউকেও নয়। ভয় তো পাইনি।

"সুপ্রীতির গলার মধ্যে আজ এমন একটি দৃঢ় সন্দেহ ছিল যে, তারপরেও আমাকে অস্বীকার করতে দেখে আরো অবাক হল। আরো নিশ্চিত হলো আমার সম্পর্কে যে, কোথায় একটি গণ্ডগোল ঘটেছে।

"কিন্তু আমার উপায় নেই। এমনি করে মিথ্যের পর মিথ্যের পাহাড় সাজিয়ে, তারই আড়ালে চলতে হবে আমাকে। এইটি আমার ভবিতব্য।

"তারপর যে কথাটি জানা আমার বাকী ছিল, তাও আমার কাণে এল।

"একদিন ভেতর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দাঁড়ালাম থমকে। শুনলাম নীচে অন্নপূর্ণা বলছেন, হ্যাঁ, নীলু বড় ভয় পেয়েছে। বলছিল, পিসিঠাকরুণ, জামাইবাবু তো বড় গুণী মানুষ। ছোট মুখে কী আর বলব, কোনদিন তো কোন বেচাল দেখিনি। কিন্তু এত টাকা কিসে খরচ করছেন, বুঝিনে।

"কার সঙ্গে কথা বলছে? পরমুহূর্তেই মালতীর গলা শুনতে পেলাম, পিসিমা, নীলু দাদার অত ভাবনার কী আছে। তাঁরটা তিনিই খরচ করছেন, তিনিই বুঝবেন।

"পিসিমা: তা জানি। তবু বড় ভয় হয়!

"মালতী: ভয়ের কী আছে পিসিমা? তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বোঝেন।

"বুঝলেও, অবুঝ হতে কতক্ষণ? পুরুষমানুষ তো।

"না না, ছি পিসিমা। ওঁর সম্পর্কে ও কথা আমি শুনতে চাইনে। এসব কথা তুমি নীলুদাকে বলতে বারণ করো।

"আমি চোরের মত পা টিপে টিপে উঠে গেলাম ওপরে। কারুরই কিছু জানতে বাকী নেই! টাকা নেওয়ার সব কথাই মালতী জানত। জিজ্ঞেস করতে পারেনি শুধু ভয়ে ও সংশয়ে। না জানি কী শুনতে হবে, সেই আতঙ্কে। তারপর দেখলাম, মালতী লুকিয়ে কাঁদছে ওপরের দালানে। সে জানে, আমি বাইরে গেছি। এ কান্না তার বুকের রক্তগোলাপের নিষ্ঠা।

"তার এই কান্না দেখেও আমি বুঝতে পারলাম না তার মনের সংশয় সভয়ে শিউরে উঠছে।

"চারদিকের এই টানাপোড়েনে, আমার স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। আমি ছায়া দেখলে চমকাই।

"আমার ঘর নেই, বাইরেটাও ভাজ দিয়ে ঘেরা। সত্যি শুধু পিস্‌টন রড্‌টা।

"আজকাল মালতীর উপর বিতৃষ্ণাটা থিতিয়ে গেছে। বরং মাঝে মাঝে বড় করুণ মনে হয়। আমি কোথাও বাইরে গেলে সে কাণ পেতে বসে থাকে। উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে কলকাতায় গেলে। ফিরে এলেই ছুটে আসে নেমে।

"একদিন ছাতে উঠতে গিয়ে সিঁড়িকোঠার ঠাকুর ঘরে শুনতে পেলাম, মালতী ফিসফিস করে বলছে এক বছর পূর্ণ হতে বাকি আছে জানি। তাকে ছুঁতে না পাই, দেখতে না পাই, সে যে বিদ্রূপ, তা তো বুঝি। কোন পাপ তো করিনি। তবে, কেন, কেন?

"ছাতে যাওয়া হল না। প্রথমেই মনে পড়ল কুসুমের কথা। হয়তো কুসুমকেই বলছে এমনি করে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। নিঃশব্দে উঁকি দিলাম। হঠাৎ বড় লজ্জা হল। মালতী বিস্রস্ত। তার নিটোল পুষ্ট শরীরে জামা নেই, কাপড়ও অগোছাল। কুমারী বুকে হারের নীল পাথরের লকেটটি তার চোখের মণির মত চকচক করছে। এমন বিস্রস্ত একজনকেই দেখেছি এতদিন।

"পা টিপে নেমে এলাম। কেবলি মনে হতে লাগল, এ মেয়েটির সব কথা প্রাণ খুলে যাকে বলতে পারি, সে সুপ্রীতি। আমার সমস্ত পাপ ব্যক্ত করতে পারি যার কাছে, মাথা নত ক'রে যে মহিমময়ী নারীর কাছে আমি আত্ম-সমর্পণ করতে পারি, সে সুপ্রীতি। পারিনে শাস্তির ভয়ে। কী শাস্তি আমাকে দেবে সুপ্রীতি।

"একদিন কলকাতা থেকে এসেছি। মালতী ছুটে আসতে গিয়ে আছাড় খেয়ে কপালটি কাটলে। সবাই ভয় পেল, ছুটে এল সবাই। আমি ছুটে গিয়ে নিতে পারলাম না মালতীকে। ও ইচ্ছে করে মাথা কাটেনি, কিন্তু কাটার পর বোধহয় একবার ইচ্ছে হয়েছিল, আমি ওকে স্পর্শ করব। করিনি, কিন্তু বড় বাজল মনে, বড় কষ্ট হল মালতীর জন্যে।

"কিন্তু এ আমি কেন পাপ করলাম। আমি যে কোনদিকেই তাল রাখতে পারছিনে।

"নিবারণ এসে মাঝে মাঝে হরিদাসের কুকীর্তির কাহিনী শোনায় আমাকে। সে লুকিয়ে মাঝে মাঝে যায় কলকাতায়।

"তারপরেই হরিদাসের একটি চড়া দাবি এল, দশ হাজার টাকার।

"আমি মার খাওয়া পশুর মত মরীয়া হয়ে চীৎকার করে উঠলাম, তা হবেনা হরিদাস।

"হরিদাস তেমনি তার যুক্তিহীন নিষ্ঠুর গলায় জিজ্ঞেস করল, কেন?

"কেন কিসের আবার? সবকিছুর একটা সীমা আছে। কত টাকা এতদিন নিয়েছ হরিদাস, জান?

"জানি, আঠারো হাজার।

"তবে? তুমি কি মনে করেছ, নীরগাঁয়ের সবাই ঘাস খায়? তারা কিছুই বোঝে না।

"হরিদাস বলল, তারা বোঝে, কিন্তু আমার পাওনাদারেরা কিছুতেই বোঝে না। তারা আমাকে ছাড়বেনা কিছুতেই।

"হরিদাসের কথার মধ্যে যা-ই থাক আমি জানি, তার চারপাশেও ভয়ঙ্কর বেড়াজাল ঘিরে এসেছে। কিন্তু আমার সর্বনাশ যে কিছুতেই রোধ করা যাবে না। আমি অসহায় ক্রোধে, চাপা গলায় চীৎকার ক'রে ধরলাম, আমি কিছুতেই পারব না হরিদাস।

"হরিদাস জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সুপ্রীতির কাছে যেতে মাত্র ছ পয়সা ট্রাম ভাড়া লাগে নিখিল।

"আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলি ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। বললাম, তার আগে আমি তোমার ঠ্যাং ভাঙ্গব।

"জায়গাটি ছিল সেই নিবারণেরই দোকান। চালাচ্ছে তার সেই প্রৌঢ়া প্রেমিকা।

"হরিদাস আমার দিকে এক মুহূর্ত দেখে, হঠাৎ হেসে উঠে বলল, ঠ্যাং ভাঙ্গতে পারবি কিনা জানিনে। কিন্তু তবু আমার যাওয়া আটকাবে না।

"আমার হাত পা অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। সমস্ত রক্ত কোথায় নেমে যাচ্ছে কলকল করে। তবু আমার প্রাণ বড় শক্ত। আমার গলার স্বরে আবার ভয় নেমে এল। বললাম, হরিদাস, টাকাটা কমাও।

"হরিদাস: না। কমালে আমার চলবে না। তাহলে আমাকে জেলে যেতে হবে। তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, আর আমি এখন জেলে গেলে বীণা আর বাঁচবে না। ও মরতে বসেছে।

"বীণাদি'র চিন্তা দেখে ঘৃণায় ও অবিশ্বাসে তার মুখও দেখতে ইচ্ছে করল না আমার।

"পরে বুঝেছিলাম, হরিদাসের মত পাপী জীবনে একবার একটি সত্যি কথা বলে। বীণাদি'র বিষয়ে ওই কথাটি তার চরম সত্যি ছিল। আর তেমনি, পরে অবাক হয়েছিলাম ভেবে, হরিদাসও বীণাদি'কে শেষ পর্যন্ত ভালবেসেছিল!

"সে আবার বলল, সাতদিনের মধ্যে টাকাটা আমার চাই নিখিল। বলে হরিদাস চলে গেল।

"আমার এইদিনের মূর্তি দেখে সুপ্রীতিও কেঁপে উঠল। ভাবলাম, ওকে সব বলে ফেলি। বলে ফেলে, আমার জীবন মরণ সব কিছু, ও আর মিঠু যা শাস্তি দেয়। তাই মাথা পেতে নিয়ে, দাঁড়াই ভাগ্যের দ্বারে। কিন্তু পারলাম না।

"সুপ্রীতি ছাড়ল না। বড় অসহায় ব্যাকুলভাবে আমার হাত ধরে বলল, কী হয়েছে তোমার?

"এখনো আমার ছলনা। বললাম, কিছু নয়। তবে ভুগ্‌গি আমি এবার সবকিছু ছেড়ে কলকাতায় এসে থাকব। এ কাজ আমি আর করতে পারব না।

"সুপ্রীতিও অস্ফুট কান্নার সুরে বলল, তা-ই এস, তা-ই এস তুমি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে, সেখানে কী ঘটে যাচ্ছে। আমিও আর এ অন্ধকার সহ্য করতে পারছিনে। তোমাকে এভাবে দেখে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারছিনে।

"মীরগাঁয়ে এসে, শেষ পর্যন্ত মালতীর শরণাপন্ন হলাম। আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলে, ওর দুটি হাত ধরলাম।

"মালতী কেঁপে উঠে বলল, কে? পরমুহূর্তেই, তুমি? তুমি ছুঁলে আমাকে?

"আসলে এই ছোঁয়ার মধ্যে আমার অন্তঃসলিলে ছিল [illegible] । 'মালতীর মনে নতুন দাগ ফেলতে চাইছিলাম । বললাম, হ্যাঁ ।

"কয়েক মুহূর্ত বোধ হয় মালতীর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল। জীবনে এই ওর প্রথম পুরুষের স্পর্শ। শুধু পুরুষ নয়, ওর অন্তরালের দেবতা। কথা বলতে পারল না। দেহসংলগ্ন হয়ে শুধু কাঁপতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেন চমকে উঠল। আমার বুকে মুখে হাত বুলিয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার ?

আমার আর নীলু কিংবা হরেন গোমস্তার কাছে টাকা চাইবার সাহস ছিলনা। বললাম, মালতী, বড় বিপদে পড়েছি।

"মালতী বলল, কী, বল ?

"বললাম, আমার কাকার বড় বিপদ। অফিসের ক্যাশ ভেঙেছেন, দশহাজার টাকা সাতদিনের মধ্যে দিতে না পারলে তাঁর জেল হয়ে যাবে।

"মালতী বলল, কী সর্বনাশ ! তোমার কিছু হবে না তো ?

"না, কিন্তু কাকা জেলে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

"এই বোধ হয় প্রথম মালতী আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। ভীষণ ভয় পেয়েছে ও। ওর চোখের মণি দুটি কাঁপতে লাগল তিরতির করে। ওর সর্বাঙ্গে যেন একটি যন্ত্রণার বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই হাত ধরার প্রীতি যে আসলে টাকা, এ অপমানটুকুও যেন বুঝেছে ও। তবু আমাকে অভয় দিল, আচ্ছা, ব্যবস্থা করছি।

"কিন্তু দশহাজার টাকা তাকে নীলুর কাছেই চাইতে হ'ল। নীলু বললে, আচ্ছা। শুধু আমরা টের পেলামনা, সব কথা লিখে সে চিঠি পাঠিয়ে দিলে বৃন্দাবনে মাধববাবুর কাছে। সাত দিনের আগেই মাধববাবুর চিঠি এল, টাকা দিওনা, বাড়ি যাচ্ছি।

"কিছুই জানতে পারলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম টাকার জন্যে। সাতদিনের দিন নীলু বলল, টাকাটা তো আজো হলনা। অনেকগুলি টাকা। আর একটা দিন দেরি করতে হবে। কাল সকালেই হবে।

"হরিদাসের মুখ মনে পড়ল আমার। দাঁতে দাঁত চেপে রাত্রিটা কাটালাম। সকালে গিয়েই হরিদাসকে টাকা দেব। রাত্রে যখন আমি রুদ্ধশ্বাসে এই কথা

ভাবছি, তখন হরিদাস গিয়ে দাঁড়িয়েছে সুপ্রীতির কাছে। এ ঘটনা পরে জেনেছি। হরিদাস তার শেষ মুহূর্ত দেখে, মৃত্যুদূতের মত এসে দাঁড়িয়েছে। তার সব সর্বনাশ এসেছে ঘিরে। সর্বনাশের কিছুই সে আর বাকী রেখে যাবে না।
"তাকে দেখেই সুপ্রীতি চমকে উঠল বলল, আপনি! সুপ্রীতি হরিদাসকে চিনত বিলক্ষণ। হরিদাস তখন টলছে। সে গড়গড় করে বলে গেল সব কথা।
"সুপ্রীতি মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠল তার কথার মধ্যে, এ মিথ্যে, সব মিথ্যে কথা।
"কিন্তু হরিদাস থামল না। আর সুপ্রীতির বুকটা সত্যিই পুড়ে যাচ্ছিল। সে প্রতিটি দিন প্রতিটি ঘণ্টা দেখে নিচ্ছিল মিলিয়ে। তারপরে সে যখন শেষ সীমায় পৌঁছুল, তখন ভয়াবহ স্বরে চিৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা। বেরিয়ে যান বলছি, বেরিয়ে যান।
"হরিদাস সেই মূর্তি দেখে পালাল। সুপ্রীতি দরজা বন্ধ করে অবাক অবোধ মিঠুকে বুকে নিয়ে বারবার বলতে লাগল, এ মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে।

"কিন্তু তখনো একথা আমি জানিনে। রুদ্ধশ্বাস রাত্রি কাটিয়ে, সকালে শুনলাম টাকাটা পেতে একটু দেরী হবে।
"সকালে যখন টাকাটা আসতে দেরি হচ্ছে, তখন মালতী বলল, তুমি আমার সমস্ত গহনা নিয়ে যাও। তাতে দশ-হাজার হয়ে যাবে।
"আমি বলতে যাচ্ছিলাম, দাও। সেই মুহূর্তে একজন চাকর এসে বলল, জামাইবাবু, কলকাতা থেকে একজন মেয়েছেলে এসেছেন আপনার কাছে।
"বলতে না বলতেই দেখলাম, সুপ্রীতি!
"আমার সেই রাজেন্দ্রাণী এসেছে বৈরাগিনীর বেশে। রাত্রি জাগা চোখ কিন্তু অদ্ভুত প্রদীপ্ত। উস্কো খুস্কো চুল। কাঁধে একটি ছোট্ট ব্যাগ। আমার সেই পুরানো দিনের সঙ্গিনী যেন। হাওড়া থেকে প্রথম লোকালেই এসেছে।
"কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠে বললাম, তুমি?
"মালতী বলে উঠল, কে?

"দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি। কোনরকমে গলা দিয়ে বেরুল, আমার স্ত্রী।
"তখনো যেন সুপ্রীতি বুঝতে পারেনি। মালতীকে অপলক চোখে দেখতে দেখে সে আমার স্ত্রীর পরিচয়ে হাত তুলে নমস্কার করল। অন্ধ মালতীও তাকেই স্ত্রী বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি ভেবে নমস্কার করল।
"মালতী আবার বলে উঠল, কিন্তু কে এসেছেন বললে না তো ?
"তার আগেই সুপ্রীতি মালতীকে দেখে বাকীটুকু বুঝেছে। সে তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়েও দাঁড়াল শক্ত হয়ে। চোখে জল এসে পড়েছে। কিন্তু আশ্চর্য রকম ভাবে, তরল গলায় হেসে বলল, আমি। আমাকে তো আপনি চিনবেন না ভাই। আমার নাম সুপ্রীতি।
"মালতী কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে সুপ্রীতির কাছে এসে পড়ল। সুপ্রীতি তাড়াতাড়ি জল মুছল চোখের। মালতী তার হাত ধরে বলল, আপনি কে ?
"সুপ্রীতি মালতীর হাত ধরা অবস্থাতেই একবার তাকাল আমার দিকে। মনে হল, আমার নয়, ওরই মুখখানি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল একেবারে। তবু হেসে বলল, এক সময়ে আপনার স্বামীর সঙ্গে পড়তুম। শুনেছিলুম, উনি এখানে বিয়ে করেছেন। বলতে বলতে সুপ্রীতির ঠোঁট একবার কেঁপে উঠল। আবার বলল, এদিকে এসেছিলুম একটু দরকারে। আপনাদের দেখে গেলুম।
"আমার ভেতর থেকে কে যেন চীৎকার করে উঠতে চাইছিল। কিন্তু আশ্চর্য ! কথা বলবার, নড়বার ক্ষমতাটুকুও আমার নেই।
"মালতী খুশি হয়ে উঠল। সত্যি ? আমি তো চোখে দেখতে পাইনে, তবু বুঝতে পারছি, আপনি খুব সুন্দর।
"সুপ্রীতি কান্নার দমকটা হাসিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে বলল, তাই নাকি ? কিন্তু আপনি যে তার চেয়ে অনেক সুন্দর।
"মালতীর মুখে চকিতে একটু ছায়া দেখা গেল। বলল, সুন্দর না ছাই ! কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না, বসুন। আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি কিছু বলছনা যে ?
"আমি ? দেয়াল ধরে দাঁড়িয়েছিলাম রক্তশূন্য মুখে। মনে হচ্ছিল, ওপর থেকে ছাদটা নেমে আসছে মাথায়।

"কিন্তু আশ্চর্য রকম হেসে জবাব দিল সুপ্রীতি, ওর বোধ হয় আজ আর কিছু বলার নেই। ও অবাক হয়ে ভাবছে, ওর এতবড় রাজত্বটা কেমন করে দেখে ফেললুম। বলে হেসে উঠল সশব্দে। কিন্তু ছেঁড়া তারের মত সে শব্দ সেই মুহূর্তেই বেসুরো হ'য়ে থেমে গেল। তবু আমি কিছুতেই কথা বলতে পারছিনে।

"মালতী হেসে বলল, সুপ্রীতিকে, কিন্তু আপনাকে একটু থাকতেই হবে।

"সুপ্রীতি বলল, না ভাই, আজকে বসব না। আপনাদের দুটিকে দেখার বড় সাধ ছিল, সেই যুগলকে দেখে গেলুম।

"আবার জল এল মালতীর চোখে। মালতীও যেন আজ মুখের বাঁধন খুলে গেছে। বলল, আমাদের দুজনকে দেখতে? আপনাদের সঙ্গী পড়োটি অনেকদূরের মানুষ। উনি একলা, দোকলা তো নন।

"মালতীর মুখ দিয়ে বোধ হয় একটি বড় সত্য বেরিয়ে পড়ল। আমি একলা, দোকলা নই।

"সেই মুহূর্তে সুপ্রীতি আর একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর মালতীর দিকে ফিরে বলল, ও আপনাকেও দূরে সরিয়ে রেখেছে? রাখবেই, ও যে পাষাণ!

"পাষাণ! না না, আমি ভীরু, পাপী, মিথ্যাবাদী। পাষাণ নয় বলেই আজ এই বিড়ম্বনা।

সুপ্রীতি আমার বলল, চলি ভাই।

"মালতী বারবার তাকে ধরে রাখতে চাইল। তারপর বলল, আবার আসবেন তো?

"সুপ্রীতির গলায় তখন কথা নেই। কোন রকমে বলল, আসব।

"তারপর আমার দিকে শান্ত মুখে, স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, চলি নিখিলেশ। বহুদিন, বহুদিন পরে আবার ওর মুখে আমার নাম শুনতে পেলাম। সেই পাঠ্যজীবনের সঙ্গিনীর মত আজ ও সহজভাবে আমার নাম নিল। বিয়ের পর থেকে বিদুষী হয়েও, কিছুতেই আমার নাম নিত না। আজ তো পুরনো দিনের মত বলতে পারছিনে, যাবে কি? পকেটে এখনো দু'কাপ চায়ের দাম আছে, এসো শেষ করে নিই।

"মালতী আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমাকে এগুলো দেব।

অর্থাৎ সেই গহনা।

"আমি কোন রকমে বললাম, না।

"মালতী : তবে, তুমি ওঁকে একটু এগিয়ে দিয়ে এস।

"তাই দিতে যাব। আজ সুপ্রীতি মালতীরই অতিথি। আজ যাব সুপ্রীতির সঙ্গে। আর ফিরব না।

"গরুর গাড়িতে করে স্টেশনে এলাম। গাড়োয়ানের জন্য এতক্ষণ কথা বলতে পারিনি। সুপ্রীতির মুখ দেখেও আমার কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না। প্ল্যাটফরমের এক কোণে এসে ডাকলাম, সুপ্রীতি, দুগ্‌গি।

"সুপ্রীতি সুস্পষ্ট উত্তর দিল, বল।

"বললাম, আমার তো কিছুই বলার নেই।

"সুপ্রীতি শান্তভাবে অনুরোধ করল, কিছু বলো না।

"অসহ্য যন্ত্রণায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। তবু বললাম, কিছু বলব না। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। আর ফিরব না।

"সুপ্রতি তীব্রভাবে মাথা নাড়িয়ে বলল, ছি, ওকথা বলো না।

"সুপ্রীতির গলার মধ্যে কী ছিল, আমি তুচ্ছ হয়ে গেলাম। তবু মরিয়া হয়ে বললাম, এসব কেন করেছি, তা বলতে চাইনে। কিন্তু তোমাকে হারাব, একথা ভাবতেও পারিনে।

"সুপ্রাতি বলল, হারাবার কথা কিছু নয়। হয়তো আমার জন্যেই সবকিছু করেছিলে। সেকথা ভাবলে, এখুনি দাপিয়ে মরা ছাড়া আর তো কিছু বলার থাকে না।

"বলে সুপ্রীতি হাসল। বহুদিন বহু মুহূর্তে ওর রক্তাভ ঠোঁটের কোণে যে বৈরাগিনীর হাসি দেখে আমি সুখের মধ্যেও চমকে উঠেছি, ভেবেছি ওই হাসির মধ্যে আরো যেন কী আছে লুকিয়ে, আজ সেই লুকনো গুপ্তিটা ঝিকমিক করে উঠল।

"হেমন্তকাল পড়ে গেছে। আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি নেই। কিন্তু একটি অদ্ভুত দীপ্তি আছে। প্ল্যাটফরমের আশেপাশে আসশেওড়া আর বিছুটির ঝাড়

ঘন কালো হয়ে উঠেছে। স্টেশনের দু'চারজন চাষীযাত্রী, স্টেশন মাস্টার সবাই আমাদের দুজনকেই দেখেছিল।

"সুপ্রীতি আবার বলল, আমার জন্যে তুমি সবই করতে পার। কিন্তু যা আমার জন্যে নয়, তা আমার হবে কেন?

"সুপ্রীতির এ সামান্য কথার মধ্যে এক অসামান্য রুদ্রাণী রূপ দেখে আমার বুক কাঁপতে লাগল। বললাম, সুপ্রীতি—

"সুপ্রীতির দুচোখের কোণ আবার চিকচিক করে উঠল। কিন্তু সুস্পষ্ট গলায় বলল, যে জন্যে করেছ, তার চেয়েও যা করেছ তার দায়িত্ব অনেক বেশি। গাড়ির ডাউন দিয়েছে। তুমি যাও, আমি ফিরি।

"আবার বললাম, মিঠুকে কোথায় রেখে এসেছ।

"সুপ্রীতি: মার কাছে।

"মিঠুর কথা মনে হতেই আমি আবার মরিয়া হয়ে বললাম, দুগ্‌গি আমি যেতে পারব না।

"সুপ্রীতি বলল, ছি! মালতীও মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ হয়ে তার এতবড় সর্বনাশ আমি করতে পারিনে। তা ছাড়া সে অন্ধ। তুমি তার ভরসা।

"আমি বললাম, তার অনেক টাকা আছে সুপ্রীতি।

"সুপ্রীতি: সেটাই তো জীবনের সব কথা নয়, শেষও নয়। এখন তো সেকথা আরো ভাল করে বুঝলুম। ব'লে সুপ্রীতি হঠাৎ বড় উদ্বেগ তীব্র গলায় বলে উঠল, তুমি যাও, চলে যাও তাড়াতাড়ি।

"আমি ব্যাকুলভাবে আর্তনাদ করে উঠলাম, দুগ্‌গি, কী করে ছাড়ব তোমাকে।

"সুপ্রীতি: বারবার বলো না ওকথা। আমি লেখাপড়া শিখেছি একটা কিছু করতে পারব। একবার পারিনি, আর একবার চেষ্টা করি। পারবই, পারবই।

"গাড়ি দেখা দিয়েছে। এখুনি এসে পড়বে। আমি বললাম, এভাবে শাস্তি দিওনা দুগ্‌গি। সুপ্রীতির গলা ভেঙে এল। বলল, শাস্তি নয়। আমার জীবনে এ সবটুকুই, তুমি অক্ষয় হয়ে রইলে। এর পরে তোমার জন্যে যে সম্মান শ্রদ্ধা থাকবে, তুমি আমার সঙ্গে এলে তা যে ধুলোয় লুটোবে।

"বললাম, লুটোক ঢুগ্গি। তোমার অশ্রদ্ধা, ঘৃণা তোমার দেওয়া সব অপমান নিয়ে আমি তোমার কাছে থাকব।

"সুপ্রীতি কান্না-দৃঢ় গলায় বলল, তুমি থাকবে, কিন্তু আমি তা কিছুতেই থাকতে পারব না।

"বলতে বলতেই ভীষণ গর্জন করতে করতে গাড়ি ঢুকল। সুপ্রীতি উঠল, কিন্তু দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। হাসতে চাইছে, কী যেন বলতে চাইছে, কিন্তু ভয়ঙ্কর কান্না সবকিছু রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

"আমি উঠতে গেলুম। সুপ্রীতি বলে উঠল, শুধু শুধু, এমন সর্বনাশ করো না।

"তার চোখে মুখে সত্যি যেন কী এক সর্বনাশকে দেখতে পেলাম। আমি উঠতে পারলাম না। গাড়ি চলে গেল।

"তারপরে ঘটনা অনেক। কথা সংক্ষিপ্ত।

"আমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যেন বুঝতেই পারিনি, কী ঘটে গেছে। হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠলাম। দেখলাম নিবারণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। সে উদ্বেগভরা গলায় আজ আমাকে 'তুমি' ক'রে সম্বোধন করল। একমাত্র লোক যে আজ আমাকে করুণা করে। বলল, দাদাবাবু, কলকাতার বউদিদিমণি সব জেনে গেল। তোমার সর্বনাশের তো কিছু আর বাকী রইল না।

"কী বলছ, বুঝতে পারছিনে।

"নিবারণ আবার বলল, বাঁড়ুজ্জেমশাইও বেন্দাবন থেকে আজ-ই আসছেন শুনলুম।

"চমকে উঠলাম। নিবারণ বলল, নীলু গোমস্তা আপনাকে চোখছাড়া করেনি। এতক্ষণে ধরে ও দেখছিল আপনাকে বউদিদিমণির সঙ্গে।

"বুঝলাম, সব শেষ হয়েছে আমার।

"যে চাষীটি গরুর গাড়িতে নিয়ে এসেছিল, সে বলল, জামাইবাবু, বাড়ি যাবেন না।

"তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আমার হঠাৎ মনে হ'ল, এ কী করলাম। মীরগাঁ আমাকে যা খুশি তাই করুক। আমি যে আজ আমার সবই ছেড়ে দিলাম। উনষাট নম্বর ডাউনের সময় হয়েছে। গাড়োয়ানকে বললাম, তুমি চলে যাও আমি একাই [illegible]কাতা যাচ্ছি।

"বিদায় নিলাম নিবারণের কাছ থেকে। তার উৎকণ্ঠিত চোখ দুটি ছল্‌ছল্‌ করছে।

"কলকাতায় এসে দেখলাম, ফ্ল্যাটে চাবি বন্ধ। বাড়িওয়ালা চাবি দিয়ে বললেন, আপনার স্ত্রী কোথায় গেছেন ছেলে নিয়ে। আপনাকে চাবিটা দিয়ে যেতে বলেছেন।

"দরজা খুলতেই, সেই পুরনোদিনের গানগুলি যেন একসঙ্গে মিলে আর্তনাদ করে ধেয়ে এল। সব আছে তেমনি। সায়া শাড়ি ব্লাউজ, মিঠুর জামা প্যান্ট। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফটোটি নেই। টেবিলের ওপরে ফটোটির ফ্রেম খোলা। তার মধ্যে সুপ্রীতি আর মিঠু নেই। শুধু আমি!

"শুধু আমি, একলা। এতদিনে আমাকে প্রকৃত নরকের সেই প্রেতটির মত মানিয়েছে।

"অনেক লিখলাম। দাঁড়াও, আমার বন্ধ ঘরের দড়জায় কড়া নড়ছে। একটু দেখে আসি।......

"সারাদিন স্নান খাওয়া হয়নি, তাই মিঠুর, হাত ধরে মালতী ডাকতে এসেছিল। বলল, আর দেরি করো না, এবার দুটি খাবে এস।

"বুঝলাম, ও বেচারীরও আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি। আমি আছি এখন মধ্য কলকাতায়, একটি নতুন ফ্ল্যাটে।

"সেদিন মীরগাঁ থেকে কলকাতায় এসে প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলাম সুপ্রীতির দাদার বাসায়। সেখানে তারা কিছুই জানে না। সুপ্রীতির মা বললেন, আমাকে তখুনি পাঠিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে ছেলে নিয়ে। কী হয়েছে, তুমি আমাকে বল নিখিলেশ।

"বললাম, ফিরে এসে আপনাকে বলব, মা। আগে আমি দুগ্‌গিকে ফি[illegible] পাই।

"ভেবেও পেলাম না, এই কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সে কোথায় যেতে পারে। তিনদিনের মধ্যে, কলকাতার কোন জায়গাই বাকী রাখিনি।

"সুপ্রীতি মারা গেছে। মীরগাঁয়ের স্টেশনের কথা মনে পড়ছে। কোনদিনই বুঝলামনা, যে মেয়ে অভাবে দুঃখেও স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরতে চায়, বাঁচবার জন্যে সে তার নারীত্ব ও প্রেমের অসম্মান, স্বামীর পাপকে স্বীকার করেনা। সুপ্রীতি মরতে চায়নি। কিন্তু ওর মন ওকে বাঁচতে দেয়নি। কলকাতায় যখন

"বললাম, লুটোক দুগ্‌গি। তোমার অশ্রদ্ধা, ঘৃণা তোমার দেওয়া সব অপমান নিয়ে আমি তোমার কাছে থাকব।

"সুপ্রীতি কান্না-দৃঢ় গলায় বলল, তুমি থাকবে, কিন্তু আমি তা কিছুতেই থাকতে পারব না।

"বলতে বলতেই ভীষণ গর্জন করতে করতে গাড়ি ঢুকল। সুপ্রীতি উঠল, কিন্তু দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। হাসতে চাইছে, কী যেন বলতে চাইছে, কিন্তু ভয়ঙ্কর কান্না সবকিছু রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

"আমি উঠতে গেলুম। সুপ্রীতি বলে উঠল, শুধু শুধু, এমন সর্বনাশ করো না।

"তার চোখে মুখে সত্যি যেন কী এক সর্বনাশকে দেখতে পেলাম। আমি উঠতে পারলাম না। গাড়ি চলে গেল।

"তারপরে ঘটনা অনেক। কথা সংক্ষিপ্ত!

"আমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যেন বুঝতেই পারিনি, কী ঘটে গেছে। হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠলাম। দেখলাম নিবারণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। সে উদ্বেগভরা গলায় আজ আমাকে 'তুমি' ক'রে সম্বোধন করল। একমাত্র লোক যে আজ আমাকে করুণা করে। বলল, দাদাবাবু, কলকাতার বউদিদিমনি সব জেনে গেল। তোমার সর্বনাশের তো কিছু আর বাকী রইল না।

"কী বলছ, বুঝতে পারছিনে।

"নিবারণ আবার বলল, বাঁড়ুজ্জেমশাইও বেন্দাবন থেকে আজ-ই আসছেন শুনলুম।

"চমকে উঠলাম। নিবারণ বলল, নীলু গোমস্তা আপনাকে চোখছাড়া করেনি। এতক্ষণে ধরে ও দেখছিল আপনাকে বউদিদিমণির সঙ্গে।

"বুঝলাম, সব শেষ হয়েছে আমার।

"যে চাষীটি গরুর গাড়িতে নিয়ে এসেছিল, সে বলল, জামাইবাবু, বাড়ি যাবেন না।

"তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আমার হঠাৎ মনে হ'ল, এ কী করলাম। মীরগাঁ আমাকে যা খুশি-তাই করুক। আমি যে আজ আমার সবই ছেড়ে দিলাম। উনষাট নম্বর ডাউনের সময় হয়েছে। গাড়োয়ানকে বললাম, তুমি চলে যাও, আমি একাই কলকাতা যাচ্ছি।

"বিদায় নিলাম নিবারণের কাছ থেকে। তার উৎকণ্ঠিত চোখ দুটি ছল্‌ছল্‌ করছে

"কলকাতায় এসে দেখলাম, ফ্ল্যাটে চাবি বন্ধ। বাড়িওয়ালা চাবি দিয়ে বললেন, আপনার স্ত্রী কোথায় গেছেন ছেলে নিয়ে। আপনাকে চাবিটা দিয়ে যেতে বলেছেন।

"দরজা খুলতেই, সেই পুরনোদিনের গানগুলি যেন একসঙ্গে মিলে আর্তনাদ করে ধেয়ে এল। সব আছে তেমনি। সায়া শাড়ি ব্লাউজ, মিঠুর জামা প্যাণ্ট। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফটোটি নেই। টেবিলের ওপরে ফটোটির ফ্রেম খোলা। তার মধ্যে সুপ্রীতি আর মিঠু নেই। শুধু আমি!

"শুধু আমি, একলা। এতদিনে আমাকে প্রকৃত নরকের সেই প্রেতটির মত মানিয়েছে।

"অনেক লিখলাম। দাঁড়াও, আমার বন্ধ ঘরের দড়জায় কড়া নড়ছে। একটু দেখে আসি।......

"সারাদিন স্নান খাওয়া হয়নি, তাই মিঠুর, হাত ধরে মালতী ডাকতে এসেছিল। বলল, আর দেরি করো না, এধার দুটি খাবে এস।

"বুঝলাম, ও বেচারীরও আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি। আমি আছি এখন মধ্য কলকাতায়, একটি নতুন ফ্ল্যাটে।

"সেদিন মীরগাঁ থেকে কলকাতায় এসে প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলাম সুপ্রীতির দাদার বাসায়। সেখানে তারা কিছুই জানে না। সুপ্রীতির মা বললেন, আমাকে তখুনি পাঠিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে ছেলে নিয়ে। কী হয়েছে, তুমি আমাকে বল নিখিলেশ।

"বললাম, ফিরে এসে আপনাকে বলব, মা। আগে আমি দুগ্‌গিকে ফিরে পাই।

"ভেবেও পেলাম না, এই কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সে কোথায় যেতে পারে। তিনদিনের মধ্যে, কলকাতার কোন জায়গাই বাকী রাখিনি।

"সুপ্রীতি মারা গেছে। মীরগাঁয়ের স্টেশনের কথা মনে পড়ছে। কোনদিনই বুঝলামনা, যে মেয়ে অভাবে দুঃখেও স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরতে চায়, বাঁচবার জন্যে সে তার নারীত্ব ও প্রেমের অসম্মান, স্বামীর পাপকে স্বীকার করেনা। সুপ্রীতি মরতে চায়নি। কিন্তু ওর মন ওকে বাঁচতে দেয়নি। কলকাতায় যখন

লুকিয়ে ফিরছিলাম ওর সন্ধানে, ও ততদিনে অনেক জায়গায় ঘুরেছে। কলকাতার আশেপাশে, ও চেনা বান্ধবীদের বাড়িতে গেছে। তারপর বাংলার সুদূর সীমান্ত থেকে, বাংলার বাইরে এলাহাবাদে পর্যন্ত মৃন্ময়ের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। মৃন্ময়কে বোধহয় তোমার মনে আছে। সে আমার আর সুপ্রীতির সহপাঠী ছিল। ওরা সকলেই ভয় পেয়েছে, বিস্মিত হয়েছে, ভিতরে ভিতরে কিছু একটা ঘটেছে ভেবে। কিন্তু আমার ঠিকানা না পেয়ে কিছুই জানতে পারেনি।

"সুপ্রীতি হয়তো, শান্তভাবে কলকাতাতেই কোথাও চাকরি টাকরি করে একটি নিরলস জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু আমি গিয়ে তাকে বিরক্ত করব, জ্বালাতন করব, সেই সংশয়ে ছেড়ে গিয়েছিল কলকাতা। আমি ওকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিতেও পারিনি।

"আর যতই ঘুরে ফিরছিল, ততই অশান্ত হ'য়ে উঠছিল। ততই ওর অসুস্থতা বাড়ছিল। একটি রক্তক্ষয়ী অভিমান ও অপমান তিলে তিলে শেষ করছিল ওকে। ওর যে এত অস্থিরতা, ও যে এক জায়গায় শান্ত হ'য়ে বসতে পারেনি তার কারণ আমাকে ভালবেসেছিল বলে। ওই একটি কারণ ওকে শেষ পর্যন্ত বাঁচতেও দিলে না। যখন ও দেখলে, অন্তিম মুহূর্ত সামনেই, তখন শেষ চিঠিটা এসেছিল, আমাদেরই সহপাঠিনী, সুপ্রীতির বান্ধবী, বনগাঁয়ের মীনার কাছ থেকে। মীনা ওখানে মাস্টারি করছিল। চিঠিটা এসেছিল আমার পুরনো ফ্ল্যাটে সুপ্রীতির সংসার যেখানে ছিল। সেই ফ্ল্যাটে তখন মালতী ছিল তার বাবা আর পিসিমাকে নিয়ে। নিবারণ তাদের সব কথা বলেছিল। বেচারী, মালতীর অবস্থা দেখে না বলে পারিনি। খবর না পেলে মালতী হয়তো মারা যেত।

"মাধববাবু সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটি পুলিশের কাছে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর সব জারিজুরি যার কাছে দুর্বল হ'য়ে পড়ে, সেই মালতী তা করতে দিলে না।

"সে বললে, তোমরা আমাকে কলকাতায় আমার স্বামীর বাসায় নিয়ে চল তিনি যতদিন না আসেন, ততদিন আমাকে ওখানেই থাকতে হবে।

"মাধববাবু আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি।

"মালতী জোর করে এসেছিল। মাধববাবুর না এসে উপায় ছিল না। ওরা খুঁজছিল আমাকে। ওরাই মীনার চিঠি পেয়ে গেছল বনগাঁয়ে। মালতী নিজে। শুধু আমি দেখতে পাইনি।

"সংসার কী বিচিত্র। মালতীর হাতে মিঠুকে দিয়ে নাকি বলে গেছে সুপ্রীতি, ওর বাবাকে ডেকে এনো। আমাকে ভাই তোমরা একটু মনে রেখো। লেখাপড়া শিখেছিলাম, সবই হয়তো করতে পারতুম, কিন্তু স্বামী পুত্র ছেড়ে মেয়ে মানুষের মরা যে কত কষ্টের তা কেউ বুঝবে না। কিন্তু বেঁচে থাকা যে আরো কত কঠিন, তাও বুঝেছি মর্মে মর্মে।

"এখানেই ইতি করি। তার আগে বলি, হরিদাস জেলে। বীণাদি সত্যি মারা গেছেন। ছেলেগুলি আছে বীণাদি'র এক ভাইয়ের কাছে।

"আর তুমি সাহিত্যিক মানুষ। এযুগের বুকে পুরনো দিনের পচা ছাপ ফেলেছি আমি। আর যা-ই হোক এ নিয়ে লেখা যায় না জানি। তবু, লিখলাম, ঘটেছে বলে। শান্তি পাব বলে।

"মানুষ হ'য়ে জন্মেছিলাম। কিন্তু জীবনের সবটাই পুতুল খেলার অপমান নিয়ে যাচ্ছি। একদিন সব রং মুছে যাবে, সব খেলা ফুরোবে, তবু মানুষের কাছে এই পুতুল খেলার কথা থেকে যাবে। মার্জনা করবে না, ধিক্কার দেবে। তুমিও দেবে।

"মালতী মাঝে মাঝে সেই একটি দিনের কথা-ই বলে, যেদিন সুপ্রীতি মীরগাঁয়ে ওদের বাড়ি গিয়েছিল। বলে, জীবনে একবার যদি আমার এই দু'চোখে অন্ধতা কেটে যেত!

"সেই একবারের অন্ধতা বড় মুহূর্তের। যার ঘুচেছে, সেই তো জিতে গেল এ জীবনে। পুতুলের অন্ধতা কোনদিন ঘোচে না।"

পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। নিখিলেশের মুখখানি ভাববার চেষ্টা করলুম। তারপর হঠাৎ মনে হ'ল, সত্যি, আর যা-ই হোক, এ কাহিনী লেখা যায় না।